MONTHLY VANGUARD
ভ্যানগার্ড

www.spb.org.bd
বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর মুখপত্র
রেজি. নং ডিএ ১৩২৬ : ২১তম বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা
আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০২৪
দাম : দশ টাকা

◆ জান-মালের নিরাপত্তা, দখলদারিত্ব বন্ধ ও নির্বাচন সংস্কারের আলোচনার আহ্বান : পৃষ্ঠা ৩
◆ বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন পটভূমি, সংগ্রাম আর ভবিষ্যতের আশা : পৃষ্ঠা ৫
◆ শাসকগোষ্ঠীর ক্ষমতার লড়াইয়ের বিপরীতে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম : পৃষ্ঠা ৪
◆ জীবন, রক্ত আর চোখের জলে বৈষম্য অবসানের স্বপ্ন : পৃষ্ঠা ১৬

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ফ্যাসিস্ট শাসকের উচ্ছেদ
স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার পদত্যাগ ও দেশ ছেড়ে পলায়ন

ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থা উচ্ছেদের সংগ্রাম জারি রাখুন

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অভ্যুত্থানকারী ছাত্র-শ্রমিক, জনতার বিজয় উল্লাস

৫ আগস্ট ২০২৪ ছাত্র জনতার অভূতপূর্ব গণজাগরণ, সীমাহীন আত্মত্যাগ ও অপ্রতিরোধ্য প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে ঘটে গেল ইতিহাস সৃষ্টিকারী গণ অভ্যুত্থান। স্বৈরাচারী ফ্যাসিস্ট সরকারের পতন, সরকার প্রধানের পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে পলায়ন, শেষে প্রতিবেশী দেশ ভারতে তার আশ্রয় গ্রহণ। ১৫ বছর প্রবল দাপটে দেশ শাসন করা একটি দলের এবং তার সরকারের এমন পরিনতি হলো কেন? এটা বুঝতে হলে একটু পিছনে ফিরে তাকাতে হবে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় থেকে গত ৫২ বছর গণআকাঙ্ক্ষা, গণচাহিদা ও গণপ্রত্যাশা ছিল অপূরিত।

তার উপর বিশেষ করে গত ১৫-১৬ বছরের দুঃশাসন, দুর্বৃত্তায়ন, তিন দফায় নির্বাচনী প্রহসন যেমন, ২০১৪ সালে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সংসদের ৩০০ আসনের মধ্যে ১৫৩ আসনে জয়ী হওয়া অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় বসা, ২০১৮ সালের নির্বাচনে আগের রাতে ভোট বাক্স অর্ধেক পূরণ করে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বিজয়ী দেখানো, ২০২৪ নির্বাচনে বিরোধী সকল দলকে বাইরে রেখে নিজেরা নিজেরা আমি-ডামির নির্বাচন করে ক্ষমতায় থাকা, প্রশাসন, পুলিশ, আমলাতন্ত্র, বিচার ব্যবস্থাসহ সকল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসূহকে দলীয়করণকৃত করে রাখা, ঋণের টাকায় মেগা প্রজেক্ট করে মেগা দুর্নীতি করা, বেপরোয়া লুটতরাজ, বিদেশে টাকা পাচার, অবিশ্বাস্য রকম অর্থ আত্মসাতের সাথে শাসকদলীয় ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের ঘনিষ্ঠতা প্রকাশ, ছাত্র সংগঠনের দৌরাত্ম্যে বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দখলদারিত্ব কায়েম, হলে সিট বণ্টনে স্বেচ্ছাচার, ভর্তি বাণিজ্য-সিট বাণিজ্য, দলীয় আনুগত্য প্রতিষ্ঠায় নিপীড়ন-জবরদস্তি, দলীয় কর্মসূচিতে অংশ নিতে বাধ্য করা, ছাত্র সংগঠন ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের একাকার দশা, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র আবরারকে ফেনী নদীর পানি নিয়ে ভারতের সাথে সম্পাদিত চুক্তির বিষয়ে ফেসবুকে পোস্ট দেওয়ায় মৌলবাদী সন্দেহে রাতভর নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা, সনাতন ধর্মে বিশ্বাসী দর্জি বিশ্বজিৎকেও একই সন্দেহে কুপিয়ে হত্যা, বিরোধী দল ও মতকে স্তব্ধ করতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী দিয়ে গুম, ক্রস ফায়ার, মিথ্যা মামলা, অজ্ঞাতনামা বলে গায়েবি মামলা দিয়ে হাজার হাজার মানুষকে ত্রাসে রাখা, বিচার প্রাপ্তিকে শাসক দলের মর্জি নির্ভর করে ফেলা, সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনী (মৌলিক অধিকার হরণকারী) বহাল রেখে একের পর এক কালাকানুন জারি করা, মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দেয়ার সুবাদে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে ব্যক্তি ও দলের ইতিহাসে রূপান্তরিত করা, স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা শেখ মুজিব পরিবারের দুই কন্যা শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা বাদে সকল সদস্যের ১৯৭৫ সালের নির্মম হত্যাকান্ডের ফলে সৃষ্ট আবেগ ও সহানুভূতিকে কাজে লাগিয়ে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি, নামকরণের প্রাচুর্য্য, আমিত্বের দম্ভ প্রকাশ, সরকারি কাজের সমালোচনাকারী ও আওয়ামী লীগ বিরোধীদের স্বাধীনতা বিরোধীদের সমান্তরালে টানা, ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব, বিশ্বের সবচেয়ে কম মজুরিতে শ্রমিক শ্রেণির দুর্বিষহ জীবনাবস্থা, শ্রমিক স্বার্থবিরোধী কালাকানুনের পাশাপাশি মালিক শ্রেণির স্বেচ্ছাচারী কর্মকাণ্ডের শিকার করা, ৪০ লক্ষাধিক শিক্ষিত বেকার তাদের ভবিষ্যত নিজ দেশে খুঁজে না পাওয়া, জাতীয় স্বার্থ উপেক্ষা করে ক্ষমতার স্বার্থে সাম্রাজ্যবাদী-হিন্দুত্ববাদী ভারতের কাছে সমর্পণবাদী নীতি এবং তাদের নানা সময়ের হস্তক্ষেপ, অস্বাভাবিক দ্রব্যমূল্যের কষাঘাত, ধনী-দরিদ্রের চরম বৈষম্য, মত প্রকাশের স্বাধীনতা হরণ (ডিএসএ), সাইবার সিকিউরিটি আইন দিয়ে নির্যাতন ইত্যাদি মিলে ক্ষোভের একটা সুপ্ত আগ্নেয়গিরি তৈরি হয়েছিল।

বিগত দিনে শাসন করা বুর্জোয়া দলগুলি জনগণের আস্থা কুড়াতে ব্যর্থ হচ্ছিল। বিশেষ করে ক্ষমতা বহির্ভূত প্রধান বিরোধী দল বিএনপি বার বার চেষ্টা করেও কার্যকর গণআন্দোলন সফল করতে ব্যর্থ হয়েছিল। জাতীয় পার্টি সরকারের অনুগত বিরোধী দলের চেহারা ও সুবিধা নিয়ে চলছিল। জামায়াতে ইসলামী ও ধর্মীয় মৌলবাদী দলসমূহ তাদের গোষ্ঠীর বাইরে জনসমর্থন টানতে পারছিল না। বাম বিপ্লবী দলসহ বামপন্থি শক্তিসমূহের দুর্বল সাংগঠনিক অবস্থান ও বিভক্তির কারণে সাড়া জাগানো আন্দোলন গড়ে তুলতে পারছিল না। তা ছাড়া বামপন্থিদের একটা অংশ শাসক দলের শরিক হয়ে বামপন্থার গায়ে কালিমা ছড়িয়েছিল। সবকিছু মিলে একটা অবলম্বন দরকার ছিল যাকে কেন্দ্র করে সুপ্ত আগ্নেয়গিরি বিস্ফোরিত হতে পারে। কোটা সংস্কারকে কেন্দ্র করে ছাত্র সমাজের পক্ষে যৌথ নেতৃত্বকারী অবস্থান সে অবলম্বন জুগিয়েছিল। শাসক দলের দম্ভ ও নিপীড়ন তাতে অগ্নিসংযোগ করেছিল যার পরিণতি ৫ আগস্টের গণঅভ্যুত্থান।

সরকারি চাকুরি ক্ষেত্রে কোটা অর্থাৎ সংরক্ষিত মাত্রা ছিল শতকরা ৫৬% (মুক্তিযোদ্ধা ৩০%, জেলা ১০%, নারী ১০%, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ৫%, প্রতিবন্ধি ১%)। একে তো কর্মসংস্থান নেই, তার উপর যতটুকু সীমিত ক্ষেত্র উন্মোচিত আছে তাতেও কোটা বা সংরক্ষিত আসনের নামে মেধা বা যোগ্যতার স্বীকৃতি প্রাপ্তরাও বঞ্চিত হচ্ছে, এই প্রক্রিয়া বিরোধী বিক্ষোভ ২০১৮ সাল থেকেই দানা বাধছিল। কোটা প্রশ্নে বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধের মহান অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ যে কোটা সংখ্যা স্বাধীনতাত্তোর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের জন্য নির্ধারিত ছিল ৩০%, তা ৫২ বছর পরে সঙ্গত কারণেই যুক্তিসঙ্গত হয় না। কারণ মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদেরও বয়স তা অনুমোদন করেনা। সেক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সম্মানসূচক নামমাত্র সংরক্ষণের বিধান রাখা যেত। আন্দোলনকারীরা

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ফ্যাসিস্ট শাসকের উচ্ছেদ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সে কারণেই সংস্কার চেয়েছিল। যাতে যোগ্যতার পাশাপাশি অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকেও বিশেষ সুবিধা, যত্ন ও পরিচর্যায় সমনাগরিক পর্যায়ে তুলে আনা যায়। সে সব বিবেচনায় শতকরা ৫ ভাগ কোটা সংরক্ষণ চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা, প্রতারণা ও নিপীড়নের পথ বেছে নেয়া হলো। এই নিপীড়নকে জনগণ শুধু ছাত্রদের উপর নির্যাতন হিসাবে না নিয়ে জনগণের উপর সহিংস হামলা হিসাবে নেয় এবং জীবন বাজি রেখে হলেও প্রত্যুত্তরের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। এক্ষেত্রে রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র আন্দোলনকারীদের অন্যতম সংগঠক আবু সাঈদের সাহসী আত্মবলিদানে ছাত্র যুব সমাজে আত্মোৎসর্গের সাহসী প্রত্যয়ে মারমুখী অবস্থান তৈরি হয়, পাশাপাশি জনগণের নির্ভরতা ও অংশগ্রহণ ব্যাপকতা নিতে থাকে। পুলিশি সশস্ত্র অবস্থানের সাথে র‍্যাব, সীমান্ত রক্ষাবাহিনী বিজিবি যুক্ত হয়। এক পর্যায়ে সামরিক বাহিনীকে নামানো হয়। মাত্র ৪-৫ দিনে প্রায় চার শতাধিক মানুষ নিহত হয়, আহত হয় কয়েক হাজার। সব মিলে জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশনের প্রাথমিক হিসেবে সাড়ে ছয়শতাধিক মানুষের মৃত্যু হয়। এত অল্প সময়ে এতো মানুষ হত্যার নজির সত্যিই বিরল। জাতিসংঘের নামাঙ্কিত সাঁজোয়া যান, হেলিকপ্টার থেকে গুলি সবই চলে। কারফিউ জারি হয়। কিন্তু কারফিউ ভেঙে, গুলি উপেক্ষা করে লাখো জনতার ঢল নামে। ৫ আগস্ট সরকার প্রধান দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়। ৮ আগস্ট ১৭ সদস্যের সরকার শপথ গ্রহণ করে। পরে আরও ৪ জন উপদেষ্টা শপথ নিলে সরকারের সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ২১ জনে। নোবেল বিজয়ী ড. মো. ইউনূছ নেতৃত্বে আসীন হন। এ সময়ে বিভিন্ন স্থানে কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে। সংখ্যালঘুদের বাড়িঘর, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কোন কোন স্থানে হামলা-লুটপাট, ভাংচুর হয়। গণরোষে শেখ মুজিবের ভাস্কর্যসহ অনেক মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্য ভাংচুর হয়। পুলিশ বাহিনীর অনুপস্থিতি, সার্বিক শূন্যতার পরিবেশ-পরিস্থিতিতে এ সব ঘটনা ঘটে। সংসদ ভবন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, গণভবনেও লুটপাট হয়। এসবই প্রধানত ছিল আক্রোশ জনিত অনিয়ন্ত্রিত কার্যকলাপ। জনগণ এসবের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসতে শুরু করেছে। অন্যদিকে নবগঠিত সরকারও তার অবস্থানকে কার্যকর জায়গায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। যদিও এই সরকারের গঠন প্রক্রিয়া ও প্রধান ব্যক্তিসহ সদস্যরা সবাই প্রশ্ন মুক্ত নয়। আমাদের দলসহ বামপন্থিরা অনেক দুর্বলতা, সীমাবদ্ধতা ও ঘাটতি লক্ষ্য করেও ছাত্র জনতার আন্দোলনের সাথী থাকা এবং আন্দোলনে উত্থাপিত 'বৈষম্যবিরোধী' স্লোগান প্রাধান্যে আসায় সরকারের শপথে শামিল থেকেছে, কারণ আমরাও আন্দোলনে অংশীদার। তবে আমরা নিরঙ্কুশ সমর্থনের বদলে পর্যবেক্ষণ ও আন্দোলনের মূল সুর রক্ষার বিষয়টিকে সামনে রেখে আপাত কৌশল নিয়ে চলবো। পাশাপাশি যে সমাজব্যবস্থা বা যে শাসন-নীতি বৈষম্যের জন্ম দেয় অর্থাৎ পুঁজিবাদী আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা তাকে বহাল রেখে যে বৈষম্য দূর হবে না এবং যে ব্যবস্থা এই বৈষম্যের অবসান ঘটাতে পারে সে পথে অর্থাৎ শোষণমুক্ত সাম্যসমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে হাঁটার বিষয়টিকে স্পষ্ট করতে থাকবো। এই পথেই বামপন্থার রাজনীতির প্রতি ছাত্রজনতার সমর্থনের আগ্রহের নতুন অবস্থা তৈরির চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

যে বিভ্রান্তিও এখন দূর করা দরকার

যেমন এবারের বিশাল বিস্তৃত ছাত্র গণ আন্দোলনটি রাজনৈতিক আন্দোলন ছিল না, এটা অরাজনৈতিক আন্দোলন ছিল। একথা যারা বলেন, তারা ভুলে যান, যে আন্দোলনে জনগণের দাবি, ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয় এবং যেখানে প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে জনগণ সম্পৃক্ত হয় সেটা রাজনীতি বর্জিত বা অরাজনৈতিক হতে পারে না। এক বা একাধিক রাজনৈতিক দল দ্বারা পরিচালিত না হলে শুধুমাত্র সে কারণেই আন্দোলন রাজনৈতিক চরিত্র বৈশিষ্ট্য হারায় না। ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বার্থে সংঘাত-সংঘর্ষকে রাজনৈতিক আন্দোলন বলা হয় না। যদিও নীতি-আদর্শবর্জিত রাজনৈতিক দলাদলিতে যে সংঘাত-সংঘর্ষ ঘটে সেগুলিতেও রাজনৈতিক উপাদান থাকে। তাতে সংকীর্ণ ক্ষুদ্র স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের বাইরে জনগণ যুক্ত হয়না। এটা উন্নত মহান কাজের স্বীকৃতি পায় না। এবারের আন্দোলন জাতীয় সীমানা ছাপিয়ে আন্তর্জাতিক নজর কেড়েছে। এই আন্দোলন শ্রীলঙ্কা, আরব বসন্ত ইত্যাদি আন্দোলনের পরিণতি বা ফল থেকে যে পৃথক সেটাও লক্ষ্যণীয়ভাবে ফুটে উঠেছে। আন্দোলনকারী ছাত্র সমাজের সুস্পষ্ট ঘোষণায় সামরিক শাসন জারি হতে পারেনি, সদ্য ক্ষমতাচ্যুতরা ফিরে আসতে পারেনি এবং স্বাধীনতাত্তোর ক্ষমতারোহী একই চরিত্রের কোন গোষ্ঠীও ক্ষমতা কব্জা করতে পারেনি। আন্দোলন পরিচালনাকারীদের মতামত ও অনুমোদনের বাইরে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়নি। তারপরও এটাকে রাজনীতি বর্জিত আন্দোলন বলা যাবে? যদিও শুধুমাত্র সদ্য গঠিত সরকারের উপর নির্ভর করে হাত-পা গুটিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে গেলে কিংবা জনমতের চাপ অব্যাহত রাখতে না পারলে গণআকাঙ্ক্ষার গতিমুখ পাল্টে যাওয়া অসম্ভব নয়।

ছাত্র রাজনীতি নিয়ে কুটতর্ক কেন?

রাজনীতিতে ছাত্র সমাজের অংশগ্রহণ শুধুমাত্র শিক্ষাঙ্গন কেন্দ্রিক ও তাতে সীমাবদ্ধ রাখার কথা উঠেছে। তাহলে বিগত ছাত্র গণআন্দোলনে ছাত্র সমাজের ভূমিকা কীভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে? ছাত্রদের শিক্ষাঙ্গন কেন্দ্রিক সমস্যা ও শিক্ষাঙ্গনে গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিত রাখার বিষয় তো প্রাথমিক কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে। এর অর্থ এই নয় শহিদ আবু সাঈদের দরিদ্র পরিবারের মতো লক্ষ-কোটি পরিবার কৃষক-শ্রমিক, শ্রমজীবী-পেশাজীবীসহ সর্বস্তরের জনগণের দুঃখ-দুর্দশা, অধিকারহীন মানুষের জীবনযন্ত্রণা বিষয়ে উদাসীন থাকবে ছাত্র সমাজ। আমাদের সর্বদা স্মরণে রাখতে হবে যে, শিক্ষাঙ্গন সমাজ বিচ্ছিন্ন কোন দ্বীপ নয়। অনেকে বিগত দিনের নষ্ট ছাত্র রাজনীতিরই দৃষ্টান্ত আনেন। নষ্ট ছাত্র রাজনীতি বৃহত্তর পরিসরে সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবক্ষয় এবং রাষ্ট্রক্ষমতার নষ্ট রাজনীতিরই অংশ হয়ে আসে এবং থাকে। নষ্ট রাজনীতি মানে আদর্শহীন, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর স্বার্থের রাজনীতি, শাসকশ্রেণির প্রতি যুক্তিহীন আনুগত্যের ও সুবিধা প্রাপ্তির রাজনীতি। রাজনীতি বন্ধে এর সমাধান হয় না। এর প্রতিকার আদর্শবাদী বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী রাজনীতির চর্চা ও ভোগবাদী ব্যক্তি স্বার্থের বদলে সাম্য-সমতা কেন্দ্রিক শিক্ষা-সংস্কৃতি যা ছাত্র জনতার স্বার্থে, জাতীয় স্বার্থে উৎসর্গীকৃত ও নিবেদিত রাজনীতির মাধ্যমে সম্ভব হয়। শ্রেণি ভাগ করা সমাজে রাজনীতিও দুই ধরনের। একটা শোষক শ্রেণির পক্ষে আরেকটা শোষিত শ্রেণির পক্ষের রাজনীতি।

ছাত্র রাজনীতি বিষয়ে আগেও আমরা বলে এসেছি, 'রাজনীতি যদি দেশপ্রেম হয়, রাজনীতি যদি সাম্যের চেতনা হয়, রাজনীতি যদি মানুষের প্রতি মানুষের নৈর্ব্যক্তিক ভালোবাসা ও হৃদয়বৃত্তির আধার হয়, রাজনীতি যদি অন্যায় প্রতিকারের উপায় হয়, রাজনীতি যদি সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার নিয়ম ও নীতি জানার বিজ্ঞান হয়, রাজনীতি যদি সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের ধারণা হয়, রাজনীতি যদি জনগণের বিবেকের স্লোগান ও নিপীড়িত মানুষের ভাষা হয়, শোষিত মানুষের রাজনৈতিক সংগ্রাম যদি মর্যাদা নিয়ে বাঁচার ও মনুষ্যত্ব ধারণ করার উপায় হয় তাহলে, রাজনীতি ছাড়া একজন ছাত্র সত্যিকার মানুষ হয়ে উঠবে কীভাবে? সমাজকে বুঝবে কীভাবে? ন্যায়-নীতিবোধের ধারণা তাদের মধ্যে জন্ম নেবে কীভাবে? 'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে/ তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে' কবির এই বাণী কী ছাত্রদের কাছে শুধুই মুখস্ত করার আর পরীক্ষা পাশের বিষয় হয়ে থাকবে চিরকাল?'

রাষ্ট্র সংস্কার প্রসঙ্গে

রাষ্ট্র সংস্কারের কথা উঠেছে। কী ধরনের সংস্কার হবে? কোন লক্ষ্যে সংস্কার কার্যক্রম পরিচালিত হবে? গণ আন্দোলনের স্লোগান ছিল 'বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন'। ফলে বৈষম্যমুক্ত রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনই মূল লক্ষ্য হিসাবে উঠে আসে। কিন্তু প্রশ্ন হলো যে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা বৈষম্য সৃষ্টি করে যাকে এককথায় পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বলা চলে, সে ব্যবস্থা বহাল রেখে বা কিছু টোটকা মেরামতি কাজ সেরে বৈষম্যমুক্ত সমাজ নির্মাণ কতটা সম্ভব হবে? এ বিষয়টি গুরুত্বসহকারে ভাবতে হবে এবং সে লক্ষ্যে আন্দোলন জারি রাখতে হবে।

বিদেশ নীতি নিয়ে যা জরুরি

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের বিদেশ নীতি এক সাম্রাজ্যবাদের সাথে গাঁটছড়া কেটে আরেক সাম্রাজ্যবাদের সাথে গাঁটছড়া বাঁধা সফল গণ অভ্যুত্থানের লক্ষ্য পূরণে সহায়ক হবে না। জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে সংবিধান বর্ণিত ২৫(গ) অনুচ্ছেদ মোতাবেক 'সাম্রাজ্যবাদ-উপনিবেশিকতাবাদ বা বর্ণ বৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামে সমর্থন করিবেন।' এই নীতি নিতে হবে। পাশাপাশি সার্বিক বিশ্বপরিস্থিতি ও নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহের সম্পর্ক-সম্বন্ধের অভিঘাত বিবেচনায় স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও জাতীয় অগ্রগতি সাপেক্ষে শান্তি-সম্প্রীতি বিবেচনায় কৌশল নিয়ে বিদেশ নীতি প্রণয়ন করতে হবে।

সংবিধান সংশোধন প্রসঙ্গে

নতুন সংবিধান প্রণয়ন, গণপরিষদ গঠন সংবিধান সভা ইত্যাদি প্রস্তাব আসছে। আমাদের সংবিধান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত সংবিধান। ফলে এর মৌল কাঠামো অক্ষত রেখে বিভিন্ন শাসনামলের সংযোজন ও পরিবর্তন যা কিছু জনগণের মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকারের পরিপন্থি এবং মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা-সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক ন্যায় বিচার ও গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ তা বাতিল করা প্রয়োজন। গণ অভ্যুত্থানের গণ আকাঙ্ক্ষা বৈষম্যমুক্ত, ফ্যাসিবাদী শাসন কাঠামোমুক্ত ও দুর্নীতিমুক্ত প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার আইনি পদক্ষেপ নিতে হবে। পাহাড়-সমতলের আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতিসহ সম্পত্তির উত্তরাধিকারে নরনারী বৈষম্য দূর করা জরুরি। সেই লক্ষ্যে সংবিধানের কতিপয় সংশোধনের বিষয়ে একটা কমিশন গঠিত হতে পারে।

অভ্যুত্থান পরবর্তী সংঘাত

গণ অভ্যুত্থান সফল হলেও তার অনেক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে এবং দেবে। পরাস্ত শক্তি আওয়ামী লীগ এবং তাদের দ্বারা দলীয়করণকৃত শাসন-প্রশাসনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রের বিতাড়িত বা মুখ লুকিয়ে থাকা শক্তি, ক্ষমতাপ্রত্যাশী দল বিএনপির পক্ষ থেকে দ্রুত নির্বাচন দাবি এবং তাদের অনেক নেতা কর্মীদের শক্তি প্রকাশের উন্মাদনা, বিগত শাসন ক্ষমতার অনুগত বিরোধী দল জাতীয় পার্টির আনুগত্যের পুরোনো স্বভাব বজায় রেখে গুছিয়ে উঠার নানা প্রচেষ্টা, ৭১-এর পরাজিত শক্তি জামায়াতে ইসলামসহ সাম্প্রদায়িক-মৌলবাদী শক্তিসমূহের একাংশের প্রকাশ্য ও গোপন নানা উশৃঙ্খল কর্মকাণ্ড বিশেষ করে ভাস্কর্য ভাঙাসহ সাম্প্রদায়িক হামলায় মদদ দান, সমাজের অপরাধপ্রবণ কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িতদের নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ, শাসন-প্রশাসনে বিধ্বস্ত অবস্থা ইত্যাদি সবকিছু মিলে ঘোলাটে পরিস্থিতি আপাত সামাল দিতে পারলেও গণমুখী পদক্ষেপ ও কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে না পারলে আরও কঠিন পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে।

অন্তর্বর্তী সরকারকে যা বিবেচনায় রাখা দরকার

এবারের গণ আন্দোলন সফল গণ অভ্যুত্থানে নেয়ার ক্ষেত্রে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী ও অংশগ্রহণকারীরা দেশের মানুষের শ্রদ্ধা-সম্মান লাভ করেছেন। যারা শহিদি মৃত্যুবরণ করেছেন তারাও জনগণের হৃদয়ে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণীয় রয়েছেন। তবে ছাত্র নেতৃবৃন্দদের খেয়াল রাখতে হবে যে, তারা জনগণের সামনে একটা বিশ্বাসযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য আন্দোলন পরিচালনাকারী শক্তি হিসাবে গ্রহণযোগ্য হয়েছিলেন। দীর্ঘকালের ধারাবাহিক রাজনৈতিক সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় সুনির্দিষ্টভাবে নেতৃত্বের জায়গায় আসেননি। তাদের নির্মোহ মনোভাব ও স্বার্থমুক্ত উদ্যোগসমূহে সে কারণে জনসমর্থন অব্যাহত রয়েছে। এক্ষেত্রে ব্যত্যয় ঘটলে বা এদের কোন প্রচ্ছন্ন স্বার্থকেন্দ্রিক অভিলাষ দেখা দিলে কিংবা তাদের ভাষা ব্যবহারে কর্তৃত্বমূলক মনোভাব প্রকাশ পেলে তা পরাস্ত শক্তিকে শক্তি জোগাবে। তাদের গণস্বীকৃতির বাইরে কোন মহলের পুরস্কার আগ্রহী না হওয়াই ভালো হবে। যাতে ব্যাপক ছাত্রছাত্রীর উদ্যোগী মনোভাবে আঘাত না লাগে এবং নিজেদের সংহতিও ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। ছাত্র সমাজকে বুঝতে হবে অন্ধত্ব, গোড়ামি ও ভোগবাদী স্বার্থপরতাই বিগত ফ্যাসিবাদের ভিত রচনা করেছিল। তাই আগামীর ছাত্র যুব সমাজকে সামাজিক চেতনা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার বিশ্লেষণ করে প্রগতির পথ চলতে হবে।

বামপন্থিরাই আগামী দিনের গণনির্ভরতার প্রধান শক্তি হয়ে উঠতে পারে। শ্রমজীবী মানুষকে সংগঠিত করা, ছাত্র সমাজের সামনে সঠিক পথ ও পন্থা তুলে ধরা, পেশাজীবীদের বুর্জোয়া দ্বিদলীয় ভাগাভাগি ও পাল্টাপাল্টি থেকে পেশার মর্যাদা রক্ষার দাবি ও আন্দোলনে তাদের সমবেত করা, নারী, আদিবাসীসহ প্রবাসী কর্মজীবীদের সমস্যা-সংকটের বিষয় তুলে আনাসহ রাজনৈতিক সঠিক দিক নির্দেশনা ও ঐক্যবদ্ধ কর্মপ্রয়াস সময়ের দাবি।

সারা দেশে সাম্প্রদায়িক হামলা সহিংসতার নিন্দা

শেষ পৃষ্ঠার পর

দেশবাসীকে ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলা হয়, এই সুযোগে বিভিন্ন জায়গায়, দুর্নীতিবাজ, লুটপাটকারীরা বিভিন্ন অফিসে তাদের দুর্নীতির ফাইল পোড়ানোর উৎসব করতে পারে। এ বিষয়ে দেশবাসীকে সচেতন থেকে দুর্বৃত্তদের রুখে দাঁড়াতে হবে।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, শত শত শহিদের রক্তদান ও দীর্ঘ লড়াই ছিল ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের লড়াই। ফ্যাসিবাদী শাসকের পতনের বিজয় ধরে রাখতে সচেতন দেশবাসীকে পাহারাদারের ভূমিকা নেওয়ারও আহ্বান জানান।

সমাবেশের পূর্বে একটি বিক্ষোভ মিছিল নগরীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে পল্টন মোড়ে এসে সমাবেশে মিলিত হয়।

বাম গণতান্ত্রিক জোটের সমন্বয়ক ও বাসদের সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সিপিবি'র সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স, বাংলাদেশ জাসদ এর স্থায়ী কমিটির সদস্য ডা. মুশতাক হোসেন, ফ্যাসিবাদবিরোধী বাম মোর্চার বেলাল চৌধুরী।

জান-মালের নিরাপত্তা, দখলদারিত্ব বন্ধ ও নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কারের আলোচনা শুরুর আহ্বান

বাম গণতান্ত্রিক জোটের সংবাদ সম্মেলন

১১ আগস্ট ২৪ রাজধানীর পুরানা পল্টনস্থ মুক্তিভবনের মৈত্রী মিলনায়তনে বাম গণতান্ত্রিক জোটের সংবাদ সম্মেলনে জান-মালের নিরাপত্তা, দখলদারিত্ব বন্ধ ও নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কারের আলোচনা শুরুর আহ্বান জানানো হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন জোটের সমন্বয়ক বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদের সাধারণ সম্পাদক বজলুর রশীদ ফিরোজ। উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স, বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক ইকবাল কবির জাহিদ, বাসদ (মার্কসবাদী)'র সমন্বয়ক মাসুদ রানা, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশরেফা মিশু, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টির নির্বাহী সভাপতি আব্দুল আলী।

বর্তমান পরিস্থিতি ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের করণীয় সম্পর্কে বাম গণতান্ত্রিক জোটের বক্তব্য

বিশেষ এক সংকটজনক বাস্তবতায় বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের করণীয় সম্পর্কে দেশবাসী ও সরকারের কাছে বাম জোটের বক্তব্য তুলে ধরতে এই সংবাদ সম্মেলন আহ্বান করা হয়েছে।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ৫ আগস্ট ২০২৪ ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতন হয়েছে। পরবর্তীতে ৮ আগস্ট ১৭ সদস্যের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়েছে। প্রধান উপদেষ্টাসহ ১৬ জন শপথ নিয়েছেন। ছাত্র গণঅভ্যুত্থানের পর 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন' এর পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল সরকার গঠনে সকল রাজনৈতিক দল, নাগরিক সমাজ ও শিক্ষকদের সাথে আলোচনা করে মতামত নেয়া হবে। অন্য কোন দলের সাথে আলোচনা হয়েছিল কিনা তা আমাদের জানা নাই। তবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের পূর্বে আমাদের জোট বাম গণতান্ত্রিক জোটের মতামত না নিলেও আমরা এই সরকারকে গণঅভ্যুত্থানের চেতনাকে ধারণ করে দেশ পরিচালনায় এগোনোর আহ্বান জানাচ্ছি।

এ জন্য সরকারের প্রতি আমরা নিম্নোক্ত দাবিসমূহ তুলে ধরছি–

◆ গত কয়েকদিনে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলাসহ দেশে যে লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসযজ্ঞসহ অরাজক ও নৈরাজ্যকর সহিংস পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তা নিয়ন্ত্রণে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করে জনজীবনে স্বস্তি ও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনা। হামলাকারীদের চিহ্নিত করে বিচারের আওতায় নিয়ে আসা।

◆ স্বাধীন নিরপেক্ষ কমিশন গঠন করে সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে জুলাই-আগস্ট এর গণঅভ্যুত্থানে সংগঠিত সকল হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িতদের এবং ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা ও তার মন্ত্রী-এমপি, দলীয় নেতা যারা উস্কানি দিয়েছেন তাদের গ্রেপ্তার ও বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বিচার, সম্পদ বাজেয়াপ্ত এবং নিহতদের পরিবারকে যথাযথ পুনর্বাসন, আহতদের সুচিকিৎসা, নিহত-আহতদের ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং সকল নিহত ও আহতদের প্রকৃত তালিকা দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রকাশ করা।

◆ গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পুলিশি হস্তক্ষেপ, বল প্রয়োগ, গুলিবর্ষণ আইন করে বন্ধ করা। ১৮৬১ সালের পুলিশ আইনের গণতান্ত্রিক সংস্কার করা। পুলিশকে ক্ষমতাসীন দলের বাহিনীতে পরিণত করা চলবে না।

◆দেশের মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত, চাঁদাবাজি ও দখলদারিত্ব বন্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধের স্মারণ ভাস্কর্য, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সাথে জড়িত স্থাপনা যারা ভাঙচুর করেছে তাদের চিহ্নিত করে বিচারের আওতায় আনা এবং স্থাপনাসমূহ পুনর্নির্মাণ করা।

◆ কোনো একক দলের নেতৃত্বে নয়, সর্বস্তরের ছাত্র জনতার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে গণঅভ্যুত্থান সংগঠিত হয়েছে। তাই সরকারি বিভিন্ন পদে ইতিমধ্যে যে সব দলীয় লোক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, তাদের অব্যাহতি দিয়ে সৎ-দক্ষ, পেশাদারিত্বসম্পন্ন যোগ্য ব্যক্তিকে নিয়োগ দেওয়া।

◆ নিত্যপণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ, বাজার সিন্ডিকেট ভেঙে দেয়াসহ লুটপাট-দুর্নীতি বন্ধ, বিদেশে পাচারকৃত টাকা ফেরত আনা, খেলাপি ঋণ উদ্ধার; দুর্নীতিবাজ, ঋণখেলাপি, সিন্ডিকেট ব্যবসায়ী ও অর্থপাচারকারীদের গ্রেপ্তার, বিচার ও তাদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা।

◆ দ্রুত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আবাসিক হল খুলে ক্লাস শুরু করা, সন্ত্রাসমুক্ত গণতান্ত্রিক ক্যাম্পাস, মেধার ভিত্তিতে সিট বণ্টন, নিয়মিত ছাত্র সংসদ নির্বাচন ও সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বায়ত্বশাসন নিশ্চিত করা। ছাত্র রাজনীতি বন্ধের পাঁয়তারা বন্ধ করা। গ্রাম শহরের শ্রমজীবীদের জন্য স্বল্প মূল্যে রেশনিং চালু করা।

◆ শিল্প কল কারখানা, ব্যাংক-বীমা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য পূর্ণ চালু ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে অর্থনীতি সচল করা।

◆ দেশের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে দলীয়করণ মুক্ত করে অবিলম্বে এসব প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করা এবং স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেয়া। এসব প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের যোগ্যতার মানদণ্ড নির্ধারণসহ আইন প্রণয়ন করে স্বাধীন কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগ প্রদানের ব্যবস্থা করা।

◆ প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য সৃষ্টি করে একক কর্তৃত্বশালী এক ব্যক্তির শাসন ফিরে আসা রোধ করা।

◆ বাক-ব্যক্তি, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, বিশেষ ক্ষমতা আইন, সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্টসহ সকল অগণতান্ত্রিক কালাকানুন, সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনী, রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম ও ৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল করা।

◆ সাম্রাজ্যবাদের সাথে গাঁটছড়াবাধা নতজানু পররাষ্ট্রনীতি পরিহার করা, বিদেশের সাথে সম্পাদিত জাতীয় স্বার্থবিরোধী সকল অসম চুক্তি বাতিল ও সকল চুক্তি জনসম্মুখে প্রকাশ করা।

◆ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শোষণ বৈষম্যহীন অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ বিনির্মাণে সংবিধানে বর্ণিত ধর্ম, বর্ণ, জাতি, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান অধিকার নিশ্চিত, পাহাড় ও সমতলের আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি, ভূমির অধিকারসহ জান-মালের নিরাপত্তা বিধান করা। পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনা শাসনের অবসান ঘটানো।

◆ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা; নিম্ন আদালতসহ বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করা; বিচারকদের যোগ্যতার মানদণ্ডসহ আইন প্রণয়ন করে উচ্চ আদালতের বিচারক নিয়োগ করা।

◆ সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই দেশ শাসন করার কথা। বিগত সময়ে শাসক শ্রেণি দেশের নির্বাচন ব্যবস্থা ধ্বংস করে ফেলেছে। তাই নির্বাচনে 'না' ভোটের বিধান, নির্বাচিত প্রতিনিধি জনগণের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী দায়িত্ব পালন না করলে প্রত্যাহার, সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতিসহ নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার করতে অবিলম্বে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলসমূহের সাথে আলোচনা শুরু করা এবং নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করে একটি অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রক্রিয়া শুরু করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা।

এ ছাড়াও ছাত্র-শ্রমিক, নারী, কৃষকসহ বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের দাবির বিষয়ে ন্যায্যতার স্বীকৃতি দেয়া ও পূরণের উদ্যোগ নেয়া। আশা করি, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার নিরপেক্ষতা বজায় রেখে তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবেন।

শক্তি প্রয়োগে শ্রমিক আন্দোলন দমন বন্ধে আইনের গণতান্ত্রিক সংস্কার করুন

মজুরি আন্দোলনে শ্রমিক হত্যার বিচার দাবি

শক্তি প্রয়োগে শ্রমিক আন্দোলন দমনের অপচর্চা বন্ধে প্রয়োজনীয় সংস্কার, বাজারদরের সাথে সঙ্গতি রেখে গার্মেন্টস শ্রমিকদের মজুরি পুনঃনির্ধারণ, মজুরি আন্দোলনে শ্রমিক হত্যার বিচার, আইএলও কনভেনশন ১২১, ১৫৫, ১৮৭ ও ১৯০ অনুস্বাক্ষর, হাইকোর্টের ২০০৯ সালের রায়ের আলোকে প্রতিটি কারখানায় নিপীড়ন বিরোধী কমিটি গঠন, জুট সন্ত্রাসী ও দালাল লালন এবং সালিসের নামে শ্রমিক ঠকানোর অপচর্চা বন্ধ, কলকারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রম অধিদপ্তর, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ ও শ্রম আদালতের প্রয়োজনীয় সংস্কার, শ্রম আইন ও বিধিমালার শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী কালাকানুন বাতিল করে শ্রম আইনে আইএলও কনভেনশনসমূহের প্রতিফলন ও মালিকের স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ থেকে শ্রমিকের পাওনা পরিশোধে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়ার প্রশাসনিক ক্ষমতা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সংশোধন এবং বিদেশে টাকা পাচারকারী মালিকদের চিহ্নিত করে শাস্তি ও পাচারকৃত অর্থ উদ্ধার করে শ্রমিক কল্যাণে ব্যয় করতে ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপশি তৈরি পোশাক ক্রেতাদের ইথিক্যাল ট্রেডিং নিশ্চিত করার দাবিতে গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্টের উদ্যোগে ১৬ আগস্ট জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্টের সভাপতি আহসান হাবিব বুলবুল এর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক সেলিম মাহমুদ এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন গার্মেন্টস ও সোয়েটার শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক কাজী রুহুল আমিন। বক্তব্য রাখেন গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্টের সহসভাপতি খালেকুজ্জামান লিপন, অর্থ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম শরিফ, নির্বাহী সদস্য আল আমিন হাওলাদার শ্রাবণ, রুহুল আমিন সোহাগ, মোহাম্মদ সোহেল, আনোয়ার খান প্রমুখ।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, বাংলাদেশে গার্মেন্টস শিল্পে চরম বৈষম্য ও শোষণ বিরাজ করছে। যে কারণে এ খাতের শ্রমিকদের মজুরি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে কম আর মালিকের মুনাফা সবচেয়ে বেশি। গার্মেন্টস মালিকরা শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত করেছে এবং মজুরি নিয়মিত পরিশোধও করছে না। চাকরি অবসানকালিন পাওনা আত্মসাৎ করতে শ্রম আইনের অপব্যবহার করছে। গণঅভ্যুত্থান এবং মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলনে নিহত গার্মেন্টস শ্রমিকদের হত্যার বিচার এবং ক্ষতিপুরণ প্রদান করতে হবে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ শ্রমজীবী তাদের দ্রুত আয় বৃদ্ধির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ ছাড়া বৈষম্যমুক্ত সমাজের আকাঙ্ক্ষা বাস্তব রূপ পাবে না।

গণ অভ্যুত্থান-২০২৪

শাসকগোষ্ঠীর ক্ষমতার লড়াইয়ের বিপরীতে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম

স্বাধীনতার সূচনালগ্ন থেকেই শাসকশ্রেণি মুক্তিযুদ্ধের মৌল চেতনা, গণআকাঙ্ক্ষা ও জনগণের সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্নকে পাশ কাটিয়ে, পীড়ন করে চলতে চলতে দেশকে এক ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের সামনে দেশকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। ক্ষমতার গদিতে উঠতে কিংবা গদি রক্ষা করতে এরা দুই রাষ্ট্রপতি খুন, জেল হত্যা, অসংখ্য রাজনৈতিক নেতাকর্মী হত্যা, সৈনিক হত্যা, ৫ বার জরুরি অবস্থা, দুইবার সামরিক শাসন, একবার পরোক্ষ সামরিক শাসন, দলাদলিতে দলীয় নেতাকর্মীরা নিজেরা নিজেদের খুন ইত্যাদি নানা অপকর্মে ৫২ বছর পার করেছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাণিজ্য ও ধর্মব্যবসা সমানতালে চালিয়েছে। শাসকশ্রেণিভুক্ত দলসমূহের মধ্যে কে চোর, কে ডাকাত এই বিতর্কে জনগণকে মাতিয়ে রাখার ঢাল অব্যাহত রেখেছিল। ভ্রষ্টপথে পরিচালিত নষ্ট রাজনৈতিক আবহাওয়া ও পরিমণ্ডলে রাজনীতিকে দুর্বৃত্তায়িত করে দুর্বৃত্তদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা তুলে দিয়েছিল। এদের দাপটের কাছে দিনে দিনে জনগণের ভূমিকা গৌণ ও ম্রিয়মান হয়ে গিয়েছিল। স্বৈরতন্ত্র, পরিবারতন্ত্র, আর লুটপাটতন্ত্র গণতন্ত্রের স্থান দখল করে নিয়েছে। দুর্নীতি-দুঃশাসন গোটা শাসনব্যবস্থাকে গ্রাস করে ফেলেছিল। সাবেক পুলিশ প্রধান, সামরিক বাহিনী প্রধান হাজার হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ ও দুর্বৃত্তায়িত কাজ সম্পাদনের সাথে যুক্ত প্রমাণিত হয়েছেন। ৫ সচিব মুক্তিযুদ্ধের ভুয়া জাল সার্টিফিকেট নিয়ে চাকরির সুবিধা নিয়েছেন। বিদেশে বাড়ি সম্পদ সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী কানাডায় দেখে-শুনে এসেছেন কিন্তু নাম প্রকাশ করেননি। দুর্নীতির জোয়ারে প্লাবন কত বিস্তৃত তা সাবেক প্রধানমন্ত্রীর কথায় জানা গিয়েছিল যে, তাঁর অফিসের পিয়ন ৪০০ কোটি টাকার মালিক এবং হেলিকপ্টারে করে ঘুরে বেড়ায়। এর যেমন কুলকিনারা নেই তেমনি শাসকগোষ্ঠীর বাগাড়ম্বর, প্রদর্শনবাদিতা, ক্ষমতার দম্ভ, কূটকৌশল মিথ্যাচার-অনাচারেরও শেষ ছিল না। দশ হাজার টাকার কাজ লক্ষ টাকায় করতে গিয়ে দেশকে দেউলিয়া দশায় ফেলা হয়েছে। জনজীবনে দ্রব্যমূল্যের কষাঘাত, কর্মহীন বেকারত্বের দুঃসহ বোঝা, ব্যাংক, শেয়ার বাজার, দেশি বিদেশি বাণিজ্য সর্বক্ষেত্রে হরিলুট, আইনের লংঘন ও অপব্যবহার, পুলিশি হয়রানি, বিচারকে বাছাই করা পদ্ধতিতে ফেলা হয়েছে, গোয়েন্দা বাহিনী কর্তৃক গণনিপীড়নের ক্ষেত্র রচনা করা, বিশ্বের সর্বনিম্ন মজুরিতে বাংলাদেশের প্রায় ৮ কোটি শ্রমজীবী মানুষের জীবনকে দুঃসাধ্য করে তোলা, বড় ঋণখেলাপিদের ঋণকে খেলাপি ব্যবসায় পরিণত হতে দেয়া, বছর বছর কালোটাকা (চুরির টাকা) কে সাদা করা তথা হালাল করার ব্যবস্থা করা, দুঃসহ জীবনের বোঝা টেনে প্রবাসে দেড় কোটি মানুষের পাঠানো বৈদেশিক মুদ্রায় দেশে বাবুগিরি আর বিদেশে টাকা পাচার, দ্বিতীয় বাড়ি, বেগম পাড়া, ব্যবসা-বাণিজ্য ও বসতি স্থাপন, দেশে হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে কৃষকরা ফসলের ন্যায্য দাম না পাওয়া, শিক্ষা-চিকিৎসার বেহাল দশা-তারপরে টাকা যার শিক্ষা-চিকিৎসা তার এই নীতি, দশ হাজার টাকার কাজ দশ লক্ষ টাকায় করতে গিয়ে অর্থনীতিকে দেউলিয়া করা, সর্বস্তরে প্রশাসন, বিচার ব্যবস্থাসহ সকল প্রতিষ্ঠানের দলীয়করণ ও দুর্নীতিতে আত্মীকরণ, ভোটের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়া সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয় দেখিয়ে ক্ষমতা, আবার রাতে ভোটের অর্ধেক কাজ সেরে ক্ষমতালাভ, সর্বশেষ আমি-ডামি সাজিয়ে ভোট নাটকে ক্ষমতার স্থায়িত্বের বাহাদুরি, জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে বা বিবেচনায় না নিয়ে ক্ষমতার স্বার্থে বিদেশি শক্তির কাছে নতজানু হওয়া ইত্যাদি মিলে জনমনে প্রচণ্ড ক্ষোভ বহুদিন থেকে জমে পুঞ্জিভূত হয়ে উঠেছিল। নব প্রজন্ম এর বাইরে ছিল না।

বিত্তবানদের সন্তানেরা বিদেশে পড়া কিংবা কাজের খোঁজে পাড়ি দেয়, কিন্তু মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তানরা আর্থিক অসঙ্গতির কারণে সে সুযোগ নিতে পারে না। আবার অনেক দুঃখে কষ্টে দেশে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারলেও সরকারি দলের ছাত্র নামধারী দুর্বৃত্তদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ থাকতে হচ্ছিল। তাদের হল দখল, সিট বাণিজ্য, গণরুম, টর্চার রুম ইত্যাদিতে অত্যাচার, সরকারি সভা-সমাবেশে জোর করে হাজিরা দেয়া ইত্যাদি প্রতিকারেরও কোন উপায় ছিল না। কারণ উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারাও বেশির ভাগ পদ-পদবি, স্বার্থ-সুবিধা লাভে শাসক দলের আশির্বাদ প্রত্যাশী ও অনুগত বাহিনী স্বরূপে বিদ্যমান ছিল। একদিকে দেশে নবপ্রজন্মের যুবক-যুবতীরা তাদের ভবিষ্যত দেখতে পায়না, অন্যদিকে এ অনাচার-অত্যাচার। এসব কিছু মিলে একটা ক্ষোভের উত্তাপ সর্বমহলে জমাট বাধা ছিল।

এমনই পরিস্থিতিতে ছাত্র সমাজের কোটা সংস্কারের আন্দোলন পুনরায় ঘোষিত হলো। এটাকে তারা বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন হিসাবেও দাঁড় করালো। এর আগে একবার ছাত্ররা জীবন বাঁচানো নিরাপদ সড়ক আন্দোলন করেছিল। সরকার সেটাকেও পেটোয়া বাহিনী দিয়ে মারপিট করে নানা ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করে সেটার ইতি টেনে ছিল। অতীত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার কোটা বিরোধী আন্দোলনকে ছাত্র নেতৃত্ব খুবই সুশৃঙ্খলভাবে গড়ে তুললো। সারা দেশের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে কলেজ-স্কুলের শিক্ষার্থীরাও পথে নেমে এলো। রাজনৈতিক চেতনা বর্জিত কোন গণ আন্দোলন হয় না। যদিও অনেকের মধ্যেই একটা বিভ্রান্তি কাজ করে। তারা প্রতিষ্ঠিত পরিচিত রাজনৈতিক দল দ্বারা পরিচালিত আন্দোলনকে রাজনৈতিক আন্দোলন হিসাবে বিবেচনা করেন। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক দল দ্বারা পরিচালিত না হলেও জনস্বার্থে যে কোন আন্দোলনই রাজনৈতিক আন্দোলন। ৫০/৫২ বছর ধরে বুর্জোয়া শাসনের গণবিরোধী অবস্থানগত কারণে মূলত : রাজনীতি বিরোধী এ মনোভাব জনমনে তৈরি হয়েছে। বামপন্থিরা কোনো দিন ক্ষমতায় ছিল না কিন্তু কিছু বামপন্থি শক্তি বুর্জোয়া শাসক দলের ক্ষমতার লেজুড় হতে গিয়ে বামপন্থার গায়েও কলঙ্ক লেপন করেছে। তাছাড়া নিষ্ঠাবান বামপন্থিদের নীতিগত বিচ্যুতি না থাকলেও সঠিক কৌশলগত অবস্থান গ্রহণের ও ঐক্যবদ্ধতার ঘাটতি ছিল। ছাত্র সমাজের এ আন্দোলনে ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতার উচ্ছিষ্টভোগী গোষ্ঠী ছাড়া সারা দেশের সর্বস্তরের মানুষের সমর্থন এ আন্দোলন ও আন্দোলনকারীদের পক্ষে ছিল।

শাসক দল অতীতের মতোই এ আন্দোলনকে কব্জা করা, বিভক্ত করা, পেটোয়া বাহিনী দিয়ে হেনস্তা করা এবং প্রয়োজনে পুলিশি অভিযান চালিযে দমন করার সহজ চিন্তায় সময় পার করছিল। আন্দোলনের পরিধি বাড়তে থাকে এবং সরকারি দল ও তাদের সঙ্গীরা ছাড়া সকল দল মতের মানুষেরা প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সমর্থন জানাতে থাকে। এ পরিস্থিতিতে শাসক দলের প্রধান এর বিরক্তিকর দম্ভোক্তি আন্দোলনকারীদের আহত করে। তিনি এক সাংবাদিকের প্রশ্নোত্তরে বলেন, মুক্তিযোদ্ধাদের নাতিপুতিদের জন্য কোটা থাকবে না রাজাকারদের নাতিপুতিদের জন্য তা থাকবে? রাজাকারের নাতিপুতিরা কোন কোটা পাবে না। আন্দোলনকারীরা আহত অনুভূতিতে বিদ্রূপাত্মক স্লোগান তোলে—তুমি কে আমি কে রাজাকার, কে বলেছে, কে বলেছে স্বৈরাচার। আবার এও বলেছে চাইতে এলাম অধিকার হয়ে গেলাম রাজাকার। কিন্তু কিছু সংবাদ মাধ্যম আংশিক স্লোগান তুলে ধরে পরিস্থিতিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার সুযোগ সরকার হাতে তুলে নেয়। মুক্তিযুদ্ধের যে আবেগ মানুষের মনে রয়েছে তাকে আহত করছে আন্দোলনকারীদের মধ্য থেকে এভাবে বিষয়টি সামনে এনে সরকারি ছাত্র সংগঠনকে ছাত্র আন্দোলন দমনে নামিয়ে দেয়। ছাত্র সমাজের প্রতিরোধের মুখে দুর্বৃত্তায়িত সরকারি ছাত্র সংগঠন নেতাকর্মীরা সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বিতাড়িত হয়। নামানো হয় পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি এবং সামরিক বাহিনী। এখন পর্যন্ত পাওয়া খবরে ছয় শতাধিক প্রাণহানি ঘটে যা এদেশের আন্দোলনের ইতিহাসে নজিরবিহীন। একজন শিক্ষার্থী ও আন্দোলনের নেতা রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র দরিদ্র পরিবারের সন্তান আবু সাঈদকে নিরস্ত্র অবস্থায় ঠান্ডা মাথায় গুলি চালিয়ে হত্যা করা হয়, সে দুই হাত দুই দিকে প্রসারিত করে দাঁড়িয়েছিল। এক হাতে লাঠি থাকলেও তাতে উদ্ধত ভঙ্গি ছিল না। আশে পাশেও কোন বিক্ষোভ সংঘাত-সংঘর্ষ কিছুই ছিল না। সরকারি দলের ছত্রছায়ায় আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে গুলি করা অবস্থার ছবিও পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধেও কোন ব্যবস্থা হয়নি। ফলে দিবালোকে দৃশ্যমানতাকে আড়াল করে তদন্তের কথা বললে সেটা বিশ্বাসযোগ্যতা পায় না। যেমন করে জজ মিয়া নাটক পায়নি। হেলিকপ্টার থেকে গুলি জাতিসংঘের লগো লাগানো ট্যাঙ্ক সাজোয়াযান অস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছে।

সবকিছু মিলে কয়েকদিন ধরে মনে হচ্ছিল দেশে যুদ্ধ চলছে। জনগণের বিরুদ্ধে শাসকদের যুদ্ধ। এই কী স্বাধীনতার মূল্য যা দিতে হচ্ছে জনগণকে অর্ধশতাব্দী পর। এক সময় সরকার বড় করে দেখাতে চেয়েছিল বড় ধরনের কয়েকটি নাশকতা এবং এর পেছনে জঙ্গি সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর ও বিএনপি-জামায়াত নামক বিরোধী রাজনৈতিক শক্তির নিরীহ ছাত্র আন্দোলনে ঢুকে সন্ত্রাসী অপতৎপরতা চালানোর চেষ্টা করছে। সরকার এভাবেই তাদের যুদ্ধকে ও মানুষ হত্যাকে জায়েজ করতে চেয়েছে। জনগণ সে কথা মেনে নেয়নি। বরং নানা আক্রমণ প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে আন্দোলনকে গণজোয়ারে পরিণত করেছে। আত্মত্যাগ আর রক্তে ভেজা এক বিজয় এসে ধরা দিল জনগণের সামনে। ফ্যাসিস্ট শক্তির পরাজয় ঘটল।

আন্দোলনকে যেভাবে দমন করার চেষ্টা করা, এটা মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশের গণশক্তিকে আরও বিপুলভাবে শক্তিশালী করেছে। বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন এ জাগরণকে অনেক বিস্তৃত করে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারকে উচ্ছেদ করেছে। এর ফলে আগামী দিনের শাসক শ্রেণির মুক্তিযুদ্ধের মৌল চেতনার বিপরীতে হাঁটা চ্যালেঞ্জের সামনে পড়বে। এই গণ অভ্যুত্থানের চেতনা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এত অসীম অনুপ্রেরণা ও শক্তির উৎস হয়ে থাকবে। বাম গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহকে সাম্প্রতিক ইতিহাসের পাঠ থেকে শিক্ষা নিয়ে নতুন শক্তিতে, সামর্থে, চেতনায় অগ্রসর হতে হবে। গণ অভ্যুত্থান ২০২৪ ফ্যাসিবাদকে হটিয়ে একটা নতুন গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের আকাঙ্ক্ষা জনগণের সামনে নিয়ে এসেছে। বৈষম্যমুক্ত ও পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকারের বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার এই সংগ্রামকে অব্যাহত রাখাই জুলাই অভ্যুত্থানের চেতনা।

কোটা সংস্কার আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের উপর হামলার নিন্দা

প্রগতিশীল শিক্ষক ফোরাম

প্রগতিশীল শিক্ষক ফোরামের সভাপতি অধ্যাপক আবিদুর রেজা এবং সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক আবুল কাশেম ও সদস্যসচিব অধ্যক্ষ মোশায়েদ হোসেন ঢালী ১৬ জুলাই এক বিবৃতিতে নিয়মতান্ত্রিক কোটা সংস্কার আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের উপর বর্বর হামলার নিন্দা করেন।

বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, সরকারি চাকরিতে কোটা পদ্ধতির যৌক্তিক সংস্কারের দাবিতে শিক্ষার্থীরা নিয়মতান্ত্রিক শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করে আসছিল। সরকারের দায়িত্বশীল পর্যায় থেকে অযাচিত মন্তব্য আন্দোলনকারীদের মধ্যে ক্ষোভের জন্ম দেয়। উক্ত আন্দোলন কোটা প্রথার সংস্কারের যৌক্তিক সমাধানের প্রক্রিয়ায় না গিয়ে এবং পরিস্থিতি প্রশমিত না করে পরিকল্পিতভাবে পুলিশ ও ছাত্রলীগ একত্রে হামলা করে। ফলে নিহত হয়েছেন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবু সাঈদ, ঢাকায় একজন, চট্রগ্রামে দুজন, আহত অনেক ছাত্র-ছাত্রী, আহত হয়েছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক খোন্দকার মো. লুৎফুল ইলাহীসহ আরও অনেকে।

নেতৃবৃন্দ মনে করেন দেশে প্রায় ৩০ লাখ গ্রাজুয়েট বেকার, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস-দখলদারিত্ব, দেশে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি, চাকরির পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস, জাতীয় জীবনে সৃষ্ট সংকট এবং গণতান্ত্রিক অধিকারহীনতা ছাত্রদের মনে যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে বর্তমান আন্দোলন তারই বহিঃপ্রকাশ। এই যৌক্তিক আন্দোলন রাজনৈতিক সমাধানের পথ অনুসরণ না করে সহিংতার দিকে ঠেলে দেওয়া জাতির জন্য মোটেই কাম্য নয়। আমরা দ্রুত হামলাকারীদের আইনের আওতায় আনার জোর দাবি জানাচ্ছি এবং একইসাথে কোটা প্রথার যৌক্তিক সংস্কারের ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

ঋত্বিক ঘটকের বাড়ি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়ায় তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা

চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সভাপতি নিখিল দাস ও সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন ১৫ আগস্ট এক বিবৃতিতে উপমহাদেশের প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক ঘটকের বাড়ি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়ার তীব্র প্রতিবাদ, নিন্দা প্রকাশ করেন।

বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, রাজশাহী নগরের ঘোড়ামারার মিয়া পাড়ার এই বাড়িতে প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক ঘটকের শৈশব ও কৈশর জীবন কেটেছে। তাঁর স্মৃতি বিজড়িত বাড়িটি দুর্বৃত্তরা ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিয়েছে, যেটি কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায় না। এই বাড়িটি দখল করার জন্য একটি মহল সোচ্চার রয়েছে। আমরা সরকারের নিকট জোর দাবি জানাই, এই ঘটনায় দায়ীদের শাস্তির আওতায় আনতে হবে এবং ঋত্বিক ঘটকের বাড়ি সংরক্ষণ করতে হবে। নেতৃবৃন্দ বাড়িটি রক্ষার্থে সকল সংস্কৃতি কর্মীসহ দেশবাসীকে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানান।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন––পটভূমি, সংগ্রাম আর ভবিষ্যতের আশা

অল্পবয়সী মা তার শিশু সন্তানকে হারিয়ে সমাধির এপিটাফে লিখেছিলেন, কেন? এই কেন শব্দটির মধ্যে তার প্রশ্ন-ক্ষোভ, হতাশা, বেদনা আর অসহায়ত্ব ফুটে উঠেছিল। বাংলাদেশের গত জুলাই-আগস্টের আন্দোলনে নিহত কিশোর তাহমিদ বা ফারহানের মা যদি এমন প্রশ্ন করেন, কেন? কেন? তাহলে তার কোনো উত্তর কি আছে?

কোনো আন্দোলনে এতো মৃত্যু কি বাংলাদেশ দেখেছে কখনো? স্বাধীনতার পরে তো নয়ই স্বাধীনতার আগেও কোন আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এতো হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয়নি। সংখ্যাটা এখন পর্যন্ত পত্রিকার হিসাব অনুযায়ী ৬২৬। অন্যন্য নানা সূত্র বলছে সংখ্যাট এর দ্বিগুণ বা তারও বেশি। মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছেই। কারণ আহত অনেকেই মৃত্যু পথযাত্রী। যারা বেঁচে থাকবে তাদের অনেকের চোখ অন্ধ হয়ে যাবে বা পঙ্গু হয়ে থাকবে। তাদের বাকি জীবনটা কাটবে একটা যুক্তি সঙ্গত দাবিতে গড়ে উঠা আন্দোলনে নির্মম হামলার স্মৃতিচারণ করে। এই দুঃখের ভার বইতে হবে একান্তই নিজেকে কিন্তু গোটা আন্দোলনের সুফল হয়তো অনেকেই পাবে।

মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সম্মান আর তাদের আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা দেশবাসীর থাকা উচিত। কিন্তু যখন ভুয়া মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ৫ হাজার ছাড়িয়ে যায়, মুক্তিযুদ্ধের আবেগকে সুবিধায় পরিণত করা আর মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নামে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার দৃষ্টান্ত তৈরি হয় তখন নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযোদ্ধা কোটা প্রশ্ন তৈরি করে বৈকি। ফলে সরকারি চাকরিতে ৩০ শতাংশ কোটার সুবিধা যখন নাতি পর্যন্ত বিস্তৃত হলো তখন অসন্তোষ বিক্ষোভে পরিণত হয়। ২০১০ সালের ডিসেম্বরের ৩০ তারিখে আওয়ামী লীগ সরকার ৩০ শতাংশ মুক্তিযোদ্ধা কোটা সরকারি চাকরির জন্য সংরক্ষণের ঘোষণা দেয়, যার মাধ্যমে বলা হয়েছিল, মুক্তিযোদ্ধাদের নাতি, নাতনিরা পর্যন্ত সুযোগ পাবে। অসন্তোষ গড়ে উঠেছিল তখনই। ধুমায়িত অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ ঘটে ২০১৩ সালের ১৩ জুলাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোটা বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের উপর ছাত্রলীগ ও পুলিশের হামলায় তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এরপর ২০১৮ সালে ৩১ জানুয়ারি কোটা পুনর্বিবেচনা করার জন্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন করলে তা প্রত্যাখ্যাত হয় মার্চের ৫ তারিখে। এরপর ২০১৮ সালের ৮ এপ্রিল কোটা বিরোধী ছাত্ররা শাহবাগ অবরোধ করে এবং ছাত্রলীগ ও পুলিশ তাদের আক্রমণ করে হটিয়ে দেয়। কিন্তু আন্দোলন চলতেই থাকে। ২৭ এপ্রিল আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিরা আন্দোলনকারীদের সাথে বৈঠক করে এবং ২০১৮ সালের ৪ অক্টোবর সরকার সকল কোটা বাতিল করে দেয়। এরপর মামলার প্রেক্ষিতে ২০২৪ সালের ৫ জুন হাইকোর্ট কোটা বাতিলকে অবৈধ ঘোষণা করে। ফলে আবার আন্দোলনের পরিস্থিতি তৈরি হয়। এবার নাম পরিবর্তন করে সরকারি চাকরিতে বৈষম্যমূলক কোটা ব্যবস্থার সংস্কারের দাবিতে গড়ে উঠে 'বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন'। এই আন্দোলনের তীব্রতা বেড়েছে ১ জুলাই থেকে। মুক্তিযোদ্ধা কোটা ঠিক আছে কিন্তু কত শতাংশ আসন থাকবে তাদের জন্য? তাদের নাতি-পুতিরা কেন কোটা পাবেন? এ যাবতকাল ৮ শতাংশের বেশি আসন পূর্ণ করা যায়নি, তাহলে ৩০ শতাংশ কোটা বহাল রাখা কেন? এইসব প্রশ্ন আলোচনা করে সমাধান করা যেত। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধার নাতি পাবে নাকি রাজাকারের নাতি পাবে? আন্দোলনকারীদের মোকাবিলা করতে ছাত্রলীগই যথেষ্ট, ছাত্রলীগ ফু দিলে সব উড়ে যাবে, এই ধরনের বক্তব্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উত্তেজনা বাড়িয়ে দেয়। আর নেতাদের মুখের কথাকে ইঙ্গিত ভেবে ছাত্রলীগ হামলা চালায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে, আহত শিক্ষার্থী বিশেষত, ছাত্রীদের চিকিৎসা নিতে গিয়ে হাসপাতালে হামলার শিকার হওয়ায় আন্দোলনকারীদের মধ্যে উত্তেজনা তীব্র রূপ নেয়। ছাত্রদের প্রবল প্রতিরোধের ফলে ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ইডেন, বদরুন্নেছা কলেজ থেকে ছাত্রলীগের নেতা কর্মীরা বিতাড়িত হয়। এরপর আন্দোলনকারীদের দমন করতে নামে পুলিশ। যার পরিণতিতে এতমৃত্যু আর আহত হওয়ার ঘটনা ঘটে।

১৮ জুলাই '২৪, বৃহস্পতিবার, দিনটা কী বাংলাদেশের মানুষ ভুলতে পারবে কখনো? এত বিক্ষোভ এবং আন্দোলনকারীদের উপর এত ভয়ংকর আক্রমণ বাংলাদেশ আগে দেখেনি। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, স্কুল কোন প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে আসেনি ছাত্ররা? একদিকে নিরস্ত্র কিশোর যুবক, সর্বোচ্চ হাতিয়ার বলতে বাঁশ এবং চ্যালাকাঠ, অন্যদিকে টিয়ার গ্যাস, সাউন্ড গ্রেনেড, রাবার বুলেট নিয়ে পুলিশ, পাশে লাঠিসোটা নিয়ে যুবলীগ, ছাত্রলীগ এবং আওয়ামী লীগের নেতা কর্মী। এই অসম লড়াইয়ে ইটের বদলে গুলি, স্লোগানের বদলে সাউন্ড গ্রেনেড। উচ্চ শব্দে কান বধির এবং রাবার বুলেটে বুক ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া। একটা বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, রাবার বুলেটের আঘাত বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বুক-মুখ এবং চোখে। ফলে সবার জিজ্ঞাসা কেন এই আক্রমণ এবং সারাদেশে কতজনকে হত্যা করা হয়েছে? উত্তর দেবে কে? প্রচার মাধ্যমের খবর মানুষ বিশ্বাস করেনি। ফলে গুজব আর আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। ইন্টারনেট বন্ধ করে দেয়ায় মানুষ কার্যত বিচ্ছিন্ন এবং অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে সরকার দ্বারা। ডিজিটাল ক্র্যাকডাউনে ব্লাক আউট করে দেয়া হয়েছে সারাদেশ।

সংঘর্ষ কোথায় হয় নাই? ঢাকা মহানগরের উত্তরা, মিরপুর, বাড্ডা, রামপুরা, শান্তিনগর, পল্টন, লালবাগ, মোহাম্মদপুর, যাত্রাবাড়ী, শনির আখড়া, কাজলা কত নাম করা যাবে? আর সারা দেশে ৪৭টি জেলায় সংঘর্ষ হয়েছে, ছাত্র-ছাত্রীরা রাস্তায় নেমেছে প্রতিটি জেলা উপজেলায়। ছাত্র হত্যা হয়েছে রংপুর থেকে চট্টগ্রাম, মাদারীপুর থেকে ঢাকায়। স্কুল ছাত্র থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র, সাধারণ মানুষ, সাংবাদিক আর শ্রমজীবী মানুষ। ক্রোধের আগুনে পুড়েছে নানা স্থাপনা। আহত হাজার হাজার।

নিহত যুবক, তরুণ আর কিশোরদের ছবির দিকে তাকালে এক বিষাদময় বিক্ষোভ কি জেগে উঠে না? চারিদিকে দুর্নীতি, লুটপাটের খবরে সয়লাব হয়ে যাওয়া দেশ আমাদের। পুলিশের আইজি থেকে প্রধানমন্ত্রীর পিওনের হাজার কোটি টাকার মালিক হয়ে যাওয়ার খবর দেখেছে দেশের মানুষ। দেখেছে ছাত্র নেতাদের বিলাসী এবং বেপরোয়া জীবন। ক্ষমতার জাদুর ছোঁয়ায় কীভাবে সম্পদশালী হয় তাও দেখেছে মানুষ। কেঁচো খুড়তে সাপ বেড়িয়ে যাওয়ার মতো ছাগল কাণ্ডে কোটি কোটি টাকার সন্ধান পেতে দেখতে দেখতে মানুষ ভাবতে শুরু করেছিল এরই নাম ক্ষমতা। ক্ষমতা হচ্ছে টাকা বানানোর মেশিন, সম্পদ দখল এবং পাচার করার শক্তি আর প্রতিপক্ষকে দমন করার অস্ত্র। দুর্নীতি, দুঃশাসন আর দম্ভের এই মিলিত শক্তির হাত থেকে দেশের মানুষের বুঝি আর রেহাই নাই। এই দুঃসময়ে হঠাৎ দমকা হাওয়ার মতো ছাত্র আন্দোলন ক্ষমতাসীনদের ভিত্তি নাড়িয়ে দিয়ে দেশের মানুষের মধ্যে দ্রুত জায়গা খুঁজে নিয়েছে।

উত্তরের দরিদ্র জেলা রংপুর। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ কিন্তু শিল্প কারখানা নেই। কৃষি পণ্যের ন্যায্য দাম পায় না, বেশি দামে কিনতে হয় শিল্প পণ্য। ফলে এ জনপদের মানুষের দারিদ্র্য ঘোচে না, জীবনে সুখের ছোঁয়া লাগে না। ফলে একটা চাকরি তাদের সন্তানদের টিকে থাকার জন্য শুধু প্রয়োজনীয়ই নয়, লোভনীয়ও বটে। সন্তানকে ঘিরে তাদের আশার বৃক্ষ বেড়ে উঠে। এরকম এক দরিদ্র পরিবারের মেধাবী সন্তান সাঈদ। ৯ ভাই বোনের অন্যরা তেমন লেখাপড়া করতে পারেনি। সাঈদ পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে বৃত্তি পেয়েছে। ভর্তি হয়েছিল বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে। টিউশনি করে নিজের পড়াশুনার খরচ চালাত, এমনকি বাবা মায়ের জন্যও মাঝে মাঝে কিছু টাকা পয়সাও পাঠাতো। অসুস্থ বাবা আর অনটনের মধ্যে সংসার চালানো মায়ের কাছে সেই ছিল আবেগ আর ভরসার কেন্দ্র। তাকে কেন্দ্র করেই অভাবের সংসারে ভবিষ্যতে একটু সচ্ছলতার মুখ দেখতে চেয়েছিল মা।

আর সাঈদ! ১৬ জুলাই রংপুরে ছাত্র মিছিলের সামনে ছিল সে। এমন বুক চিতিয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার দৃশ্য এদেশে দেখেছি কি আমরা? অথবা বুক বরাবর গুলি চালানোর দৃশ্য? দুহাত বাড়ানো যুবক গুলি খেয়ে পড়ে যাচ্ছে, এই ভিডিও যতবার দেখেছে মানুষ ততবার ধিক্কার দিয়েছে পুলিশকে। আর মা মনোয়ারা বেগমের আহাজারি স্পর্শ করেছে সবার হৃদয়। মৃত সন্তানের মুখ দেখে বুক চাপড়ে বলছেন তিনি, মোর বাবাটাক পুলিশ গুলি করিয়া মারলো ক্যান? ও তো কাউক মারতে যায় নাই। চাকরি চাওয়া কি অপরাধ? ওই পুলিশ, বাবাটাক না মারিয়া পঙ্গু করি থুইলেও তো দেখপের পানু হয়। চাকরি না দিবু না দেইস, গুলি করি মারলু ক্যা। (চাকরি না দিবা না দাও, গুলি করে মারলে কেন?) এই বুকফাটা আর্তনাদ আর হৃদয় বিদারক প্রশ্নের কি উত্তর?

একটা বাচ্চা ছেলে ফারহান! ১৭ বছর বয়স। ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের ছাত্র। কি দেখেছে জীবনের সে? কিন্তু দেখে গেল বৈষম্যের নির্মমতা। ফেসবুকে লিখেছিল, একদিন এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে। এমনভাবে বাঁচো যেন তোমাকে স্মরণ করে। আন্দোলনে এসে গুলিতে মৃত্যুবরণ করলো সে। মেনে নেয়া যায় এসব মৃত্যু? কিংবা ক্লাস নাইনের ছাত্র তাহমিদ। ছাত্রদের আন্দোলনে ছাত্রলীগ ও পুলিশের আক্রমনের খবর জেনেছে তারা এবং বিক্ষুব্ধ হয়ে নেমেছে প্রতিবাদ মিছিলে। কেন হাজার হাজার শিক্ষার্থী বিক্ষোভে ফেটে পড়লো তা বিবেচনা না করে স্বাধীনতা বিরোধীদের কাজ বলে চিহ্নিত করার ফলে যে কী বিপর্যয় নেমে আসতে পারে এবারের ছাত্র বিক্ষোভ তার অন্যতম দৃষ্টান্ত।

সরকার শেষ পর্যন্ত কারফিউ দিয়ে, সেনাসদস্যদের মাঠে নামিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছে। সাউন্ড গ্রেনেড, রাবার বুলেট, ছররা গুলি, টিয়ার গ্যাস, ইউএন (ইউনাইটেড নেশনস) লেখা সাঁজোয়া যান ব্যবহার, লাঠি পেটা তো ছিলই সাথে গণগ্রেপ্তার চলেছে। কিন্তু কী দাঁড়ালো? সরকারের জেদ, মন্ত্রীদের দম্ভ, ছাত্রলীগের আন্দোলনকারীদের ফু দিয়ে উড়িয়ে দেয়ার হুমকি এবং ন্যক্কারজনক আক্রমণ, পুলিশের নির্বিচার গুলিবর্ষণ, হেলিকপ্টার ব্যবহার করে আন্দোলন দমনের চেষ্টা, ঢাকায় গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় আক্রমণ, অগ্নিসংযোগ সবকিছুর শেষে কোটা সংস্কারের দাবি সরকার মেনে নিল। কিন্তু এরই মধ্যে ঝরে পড়েছে অনেক তরতাজা প্রাণ। এরপর শুরু হলো নতুন আক্রমণ। যারা আন্দোলনে ছিল তাদের অনেককেই হয়রানি করা হলো, আন্দোলনে অংশ নেয়া অনেকেরই আশঙ্কা তারা তাদের শিক্ষাজীবন শেষ করতে পারবে কিনা। গ্রেপ্তার আতঙ্কে অনেকেই বাড়িতে অবস্থান করতে পারছিল না।

কয়েকটি ঘটনার মধ্য দিয়ে বুঝতে অসুবিধা হবে না, শুধু শিক্ষার্থী নয় সমাজের কত স্তরের মানুষের জীবন কেড়ে নেয়া হয়েছে আন্দোলন দমন করতে গিয়ে। যে শোকের কোন সান্তনা নেই, আজীবনে শেষ হবে না যে শোক, স্বজনেরা বেদনা বহন করবে আমৃত্যু।

দুপুরে খাওয়ার পর ছাদে খেলতে গিয়েছিল মেয়েটি। রাস্তায় চলছিল সংঘর্ষ। বাবা ছাদে গিয়ে মেয়েকে কোলে নিতেই একটি বুলেট এসে বিদ্ধ হয় মাথায়। হাসপাতালে অস্ত্রোপচার, আইসিইউতে নেয়ার পরও সবাইকে কাঁদিয়ে মেয়েটি চলে যায় বাবা-মা কে ছেড়ে। সাড়ে ছয় বছর বয়সী মেয়েটির নাম রিয়া গোপ। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রিয়ার মৃত্যুর কারণ হিসেবে লেখা হয়েছে, 'গানশট ইনজুরি'।

নরসিংদীর ক্লাস নাইনে পড়া তাহমিদের বাবা রফিকুল ইসলাম ভূঁইয়া বলেন, 'লাশের ময়নাতদন্ত করার জন্য জেলা প্রশাসন থেকে আমাকে বলা হয়েছিল; কিন্তু রাজি হইনি। পুলিশ সবার সামনেই গুলি করে ছেলেকে মেরেছে, ময়নাতদন্ত করে আর কী হবে? ছেলেকে তো আর ফিরে পাব না।'

চট্টগ্রামের বহদ্দারহাটে নিহত সাইমনের লাশ দাফন হয়েছে সন্দীপে তার নিজ বাড়িতে। তার মা রহিমা বেগমের বুকফাটা আর্তনাদ বেদনাহত করেছে সকলকেই। সন্দীপের হারামিয়া ইউনিয়নে সাইমনদের জরাজীর্ণ ঘরের ভেতর থেকে ভেসে আসছিল মা রহিমার বিলাপের শব্দ। অতিদরিদ্র রহিমার পুরোনো টিনের চাল থেকে পানি পড়া রোধ করতে ঢেকে রাখা হয়েছে ত্রিপল দিয়ে। সেটা দেখিয়ে রহিমা বেগম বলছিলেন, এই ত্রিপল কিনতে সাইমন পাঁচ হাজার টাকা পাঠিয়েছিল মাস দেড়েক আগে।

অফিস থেকে কল পেয়ে সাপ্তাহিক ছুটির দিন ১৯ জুলাই (শুক্রবার) সকালে ঢাকার উত্তর বাড্ডার গুপীপাড়ার বাসা থেকে গুলশান-২-এ কর্মস্থলে যাচ্ছিলেন আবদুল গণি (৪৫)। শাহজাদপুর বাঁশতলা এলাকায় সংঘর্ষ চলাকালে তাঁর মাথার ডান পাশে গুলি লেগে বা পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। তিনি গুলশান ২-এর একটি আবাসিক হোটেলের কারিগরি বিভাগে কাজ করতেন। আবদুল গণির স্ত্রী লাকি আক্তার দুই সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে আহাজারি করতে করতে বলেন, 'আমার স্বামী তো রাজনীতি করেন না, তাহলে কেন তাঁকে মারা হলো?

আন্দোলন দমনে যে শক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে তাতে শত শত মৃত্যু ও হাজার হাজার মানুষ আহত হওয়ার খবর যেমন উদ্বেগজনক। অন্যদিকে সহিংসতা ও নাশকতার মাত্রাও উদ্বেগজনক। এসব কারা করছে, তা তদন্ত করে বের করতে হবে। কিন্তু সরকারি দল তদন্তের আগেই স্বভাবতই বিরোধী রাজনৈতিক দলকে দায়ী করছে। এমনকি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষও রাজনৈতিক দলের ভাষায় কথা বলছিলেন। এতে সঠিক তদন্তের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠে গিয়েছিল। দেশ জুড়ে এই অভ্যুত্থান চলাকালে পুলিশের সাথে সংঘর্ষের সময় চোখে আঘাত পেয়েছেন অসংখ্য মানুষ। এর মধ্যে ৫৫০ জন এক চোখ বা দুই চোখই হারিয়েছেন। পাশাপাশি আরও একটা বিষয় লক্ষণীয়। যেসব প্রতিষ্ঠানে আগুন দেওয়া হয়েছে, যেমন বন ভবন ও ইন্টারনেট ডেটা সেন্টার, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, বিআরটিএ ও বাংলাদেশ টেলিভিশন ভবন, মেট্রো স্টেশন। এগুলো সবই স্পর্শকাতর স্থাপনা। আন্দোলনে সহিংসতা যোগ হওয়ার কয়েক দিন পরে এসব স্থাপনায় হামলা এবং আগুন দেয়া হয়েছে। এগুলো সবই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা। বিশেষ করে বিটিভি ভবন ও ডেটা সেন্টার; কিন্তু রক্ষায় বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি কেন? এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ (কেপিআই) ব্যবস্থাপনার সঙ্গে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু সেখানে তা ছিল কি? স্বাস্থ্য অধিদপ্তর মহাখালী, যেখানে ১৯ জুলাই আগুন দেওয়া হয়েছিল। রাস্তার আন্দোলন দমনে হেলিকপ্টার পর্যন্ত ব্যবহার করা হলেও এগুলো রক্ষায় দৃশ্যমান পদক্ষেপ ছিল না।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, কোটা সংস্কারের মতো নির্দোষ আন্দোলন, যেখানে একটা নির্দিষ্ট দাবি ছিল, সেই দাবিকে কেন্দ্র করে এত বড় একটা ঘটনা কেন

এরপর পৃষ্ঠা ১২ কলাম ১

খুনি হাসিনা সরকারের পদত্যাগ এবং হত্যাকারীদের বিচার দাবি

বাসদের বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদের উদ্যোগে ৩ আগস্ট '২৪ জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এক বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য কমরেড নিখিল দাস, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড জুলফিকার আলী, কেন্দ্রীয় বর্ধিত ফোরামের সদস্য খালেকুজ্জামান লিপন।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান সংগঠিত হয়েছে। জনতার রায় মেনে এই মুহূর্তে শেখ হাসিনা সরকারের পদত্যাগই সমাধানের একমাত্র পথ।

ভারতীয় হাই কমিশনারের কাছে নালিশ করে সাহায্য চেয়ে শেষ রক্ষা হবে না উল্লেখ করে নেতৃবৃন্দ বলেন, সোজা আঙুলে ঘি না ওঠলে আঙুল বাঁকা করতে হয় এটা জনগণ জানে। ফলে এখনই পদত্যাগ করুন অন্যথায় ছাত্র-জনতা গণভবন দখল করলে পালানোর সময় পাবেন না।

নেতৃবৃন্দ স্বাধীন নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশন গঠন করে ছাত্র-গণ আন্দোলনে নিহত প্রতিটি ঘটনার সুষ্ঠ তদন্ত, দায়ীদের চিহ্নিত করে বিচার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। শুধু হত্যাকারী নয়, হুকুমের আসামি হিসেবে মন্ত্রী ও শাসক দলের নেতানেত্রীদেরও বিচারের আওতায় আনতে হবে।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ ছাত্র-জনতার উদ্দেশ্যে বলেন, ফ্যাসিবাদী শেখ হাসিনার পদত্যাগের এক দফা দাবিতে যেমন তীব্র ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে একই সাথে স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতা কাঠামো উচ্ছেদ করে গণতান্ত্রিক শাসন-প্রশাসন কাঠামো গড়ে তোলার দাবিও সোচ্চার কণ্ঠে তুলে ধরতে হবে।

নেতৃবৃন্দ দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত রাজ পথে থেকে সর্বাত্মক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য দেশের সর্বস্তরের ছাত্র-জনতার প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল প্রেসক্লাব থেকে তোপখানা রোড হয়ে পল্টন মোড় ঘুরে আবার প্রেসক্লাবে এসে শেষ হয়।

ঢাকেশ্বরী মন্দিরে বাম গণতান্ত্রিক জোটের নেতৃবৃন্দ

সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সুযোগ সন্ধানী দুর্বৃত্তদের রুখে দাঁড়ান

বাম গণতান্ত্রিক জোটের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ১১ আগস্ট ঢাকেশ্বরী মন্দির পরিদর্শনে গিয়ে মন্দিরে অবস্থানরত নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় নেতৃবৃন্দ দেশের কিছু এলাকায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাড়িঘর, দোকানপাটে হামলায় উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, এই দুর্বৃত্তদের রুখে দাঁড়াতে হবে। ইতিমধ্যে বাম জোটের নেতা কর্মীরা স্থানীয় প্রগতিশীল ও গণতন্ত্রমনা মানুষকে সাথে নিয়ে এই হামলা রুখে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। বিভিন্ন জায়গায় পাহারাদারের ভূমিকা পালন করছে।

বাম নেতৃবৃন্দ বলেন, এই মুহূর্তে সরকারের প্রধান কাজ হলো জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করা। একই সাথে যারা হামলা পরিচালনা করেছে তাদেরকে চিহ্নিত করে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো।

নেতৃবৃন্দ বলেন, সকল নাগরিকের এ দেশ। কোন ধর্মীয় পরিচয় বা জাতিগত পরিচয় কোন মানুষের উপরে আক্রমণ ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়াতেই হবে।

নেতৃবৃন্দ ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের রক্ষায় তাদের আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন।

বাম গণতান্ত্রিক জোটের সমন্বয়ক বাসদের সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি সিপিবির সাধারণ সম্পাদক কমরেড রুহিন হোসেন প্রিন্স, বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক কমরেড ইকবাল কবির জাহিদ, বাসদ (মার্কসবাদী) সাধারণ সম্পাদক মাসুদ রানাসহ নেতৃবৃন্দসহ ঢাকেশ্বরী মন্দিরে পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের সভাপতি বাসুদেব ধর, কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়, মনিন্দ্র কুমার নাথসহ নেতৃবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

উভয় নেতৃবৃন্দ সারাদেশে সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে দুর্বৃত্ত ও সুযোগ সন্ধানীদের রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান।

কারফিউ ভেঙে বাম দলসমূহের সমাবেশ

শেখ হাসিনার পদত্যাগ দাবি

আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের উপর নির্বিচারে হামলা এবং ছাত্রজনতার হত্যাযজ্ঞের বিচার এবং এই হত্যাযজ্ঞের দায় নিয়ে শেখ হাসিনার সরকারের পদত্যাগের দাবিতে বাম গণতান্ত্রিক জোট, ফ্যাসিবাদ বিরোধী বাম মোর্চা ও বাংলাদেশ জাসদ-এর উদ্যোগে ২৬ জুলাই পুরানা পল্টনে কালো পতাকা প্রদর্শন, কালো ব্যাজ ধারণ করে সমাবেশ ও শোক মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। শোক মিছিলের পূর্বে নিহতদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বাম গণতান্ত্রিক জোটে সমন্বয়ক ও বাসদের সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ। বক্তব্য রাখেন সিপিবির সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স, ফ্যাসিবাদ বিরোধী বাম মোর্চার বেলাল চৌধুরী ও বাংলাদেশ জাসদ এর সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক প্রধান।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, মুক্তিযুদ্ধের আগে ও পরে এত অল্প সময়ে আর কখনো এমন বর্বর হত্যাযজ্ঞের ঘটনা বাংলাদেশের মানুষ প্রত্যক্ষ করেনি। নিজেদের দলীয় ছাত্রলীগ-যুবলীগের সন্ত্রাসী ও পুলিশ-বিজিবি-র‍্যাব ইত্যাদি সরকারি বাহিনী ব্যবহার করে সরকার ছাত্র-জনতা হত্যায় মেতে উঠেছে। হাজারো মানুষ আহত হয়েছে। সর্বশেষ কারফিউ জারি করে সেনাবাহিনী নামিয়ে দমন-পীড়ন চালাতেও তারা কুণ্ঠাবোধ করেনি।

আন্দোলনের যে আগুন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে তা দমন-পীড়ন করে বন্ধ করা যাবে না। এখন সরকারের পতন সময়ের ব্যাপার মাত্র।

ছাত্র-জনতাকে নির্বিচারে হত্যার প্রতিবাদে সাংস্কৃতিক সমাবেশ ও গানের মিছিল

সশস্ত্র পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর ব্যাপক নজরদারি ও বাধার মধ্যে ২৬ জুলাই প্রতিবাদী সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহের উদ্যোগে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে প্রতিবাদী সাংস্কৃতিক সমাবেশ ও গানের মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। বিবর্তন সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক মফিজুর রহমান লালটুর সঞ্চালনায় সভায় বক্তব্য রাখেন সাংবাদিক আবু সাঈদ খান, আশরাফ কায়সার, আইনজীবী সারা হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সামিনা লুৎফা নিত্রা, মানবাধিকার কর্মী ও আইনজীবী সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন, শহীদ আসাদ পরিষদের সাধারণ সম্পাদক শামসুজ্জামান মিলন এবং গণসংস্কৃতি কেন্দ্রের সভাপতি জাকির হোসেন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ছাত্র আন্দোলন এখন তীব্র রূপ ধারণ করে এবং তা প্রতিরোধে সরকারি দলের সন্ত্রাসীরা বিপুল ছাত্র-জনতাকে নির্বিচারে হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ডের দায় সরকারকে বহন করতে হবে।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে এই সরকারের পদত্যাগের দাবি জানিয়ে কারফিউ প্রত্যাহার, সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠান ও মতপ্রকাশের গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিত এবং হামলা-মামলা, গণগ্রেপ্তার বন্ধের দাবি জানান। একইসাথে এই ফ্যাসিবাদী সরকার উচ্ছেদের সংগ্রামে সাংস্কৃতিক কর্মীসহ সর্বস্তরের জনগণের ঐক্যবদ্ধ অংশগ্রহণেরও আহ্বান জানান। সমাবেশ ও মিছিলে প্রতিবাদী সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও সমাজের বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণ ছিল।

সাংস্কৃতিক সমাবেশে প্রতিবাদী সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহের শিল্পীগণ গান ও কবিতা পরিবেশন করেন। সমাবেশ শেষে একটি গানের মিছিল প্রেসক্লাবের সামনে থেকে পুরানা পল্টন মোড়ে এসে শেষ হয়।

ফিরে দেখা : আন্দোলনের দিনগুলি

ছাত্র-জনতার আন্দোলনকালে বাসদের বিবৃতি

আন্দোলনকারীদের উপর হামলা এবং প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের নিন্দা

১৫ জুলাই ২০২৪

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ ১৫ জুলাই সংবাদপত্রে দেয়া এক বিবৃতিতে আজ দুপুরে কোটা সংস্কার আন্দোলনের মিছিল ও সমাবেশে ছাত্র লীগের নেতাকর্মীদের দফায় দফায় হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ করেছেন।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের পর গত রাত থেকেই পুলিশ কর্মকর্তাদের হুমকি ও ছাত্রলীগের হামলার প্রস্তুতি চলতে থাকে। যার ফলশ্রুতিতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে হামলার ঘটনা ঘটতে থাকে। আজ দুপুরে ইডেন কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের সশস্ত্র হামলা ও ২ শতাধিক ছাত্র ছাত্রীর আহত হওয়ার ঘটনায় প্রমাণিত হয় এই হামলা পূর্ব পরিকল্পিত।

তিনি বলেন, গতকাল প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, তিনি বিরক্ত হয়ে ২০১৮ সালে ছাত্র কোটা বাতিল করেছিলেন। কিন্তু রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহীর মুখে এ ধরনের কথা তার পদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

কমরেড ফিরোজ আরও বলেন, পরিকল্পিতভাবে এই আন্দোলনকে মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে বলে প্রচারণা চালানো হচ্ছে। অথচ যখন দেশের সকল অংশের মানুষ এমনকি মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডকাউন্সিল পর্যন্ত কোটা পদ্ধতি সংস্কারের পক্ষে মত দিয়েছে তখন ছাত্র ছাত্রীদের আন্দোলনকে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী আখ্যা দেয়া প্রকারান্তরে মুক্তিযুদ্ধের আবেগকে ব্যবহার করার একটা হীন কৌশল মাত্র।

তিনি দেশের বিভিন্ন স্থানে আন্দোলনরত ছাত্র ছাত্রীদের উপর হামলা, নির্যাতন-গ্রেপ্তার বন্ধ ও হামলাকারীদের গ্রেপ্তার করার দাবি জানান এবং কালক্ষেপণ না করে কোটার যৌক্তিক সংস্কারের দাবি করেন।

রংপুর, চট্টগ্রাম ও ঢাকায় গুলিবর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের নিন্দা

১৬ জুলাই ২০২৪

কোটা সংস্কার আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের উপর ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও পুলিশের হামলা, গুলিবর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে বাসদ-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ।

১৬ আগস্ট এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, রংপুরে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের উপর পুলিশ ও ছাত্রলীগের দফায় দফায় সন্ত্রাসী হামলা ও পুলিশের সরাসরি গুলি বর্ষণে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ১২তম ব্যাচের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ এবং স্কুল ছাত্র রীতা নিহত হন। চট্টগ্রামে মুরাদপুর ২নং গেট ও জিইসি এলাকায় যুবলীগ-ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী হামলায় তিনজন নিহত হয়েছেন। নিহত একজনের পরিচয় জানা যায় নাই, বাকি দুজনের একজন ফারুক ফার্নিচার দোকানের কর্মচারী এবং অন্যজন ওয়াসিম চট্টগ্রাম কলেজের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র। ঢাকা কলেজের সামনে একজন নিহত হয়েছে। এছাড়া সারা দেশেই নির্বিচারে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থী ও পথচারী সাধারণ মানুষের উপর হামলা করা হচ্ছে। শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয় সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ছে সর্বত্র। সশস্ত্র ছাত্রলীগ কর্মীরা পুলিশের সামনেই তাদের সহায়তায় এই ন্যক্কারজনক হামলা চালাচ্ছে। সরকার জেদ ও একগুয়েমি করে আলোচনা না করে পেটোয়া বাহিনী লেলিয়ে দিয়ে পরিস্থিতিকে জটিল থেকে জটিলতর করে তুলছে যার ফলে ৬টি তাজা প্রাণ বলি হলো।

কমরেড ফিরেজ বলেন, শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয় সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ছে সর্বত্র। সশস্ত্র ছাত্রলীগ কর্মীরা পুলিশের সামনেই তাদের সহায়তায় এই ন্যক্কারজনক হামলা চালাচ্ছে। সরকার জেদ ও একগুয়েমি করে আলোচনা না করে পেটোয়া বাহিনী লেলিয়ে দিয়ে পরিস্থিতিকে জটিল থেকে জটিলতর করে তুলছে যার ফলে ৬টি তাজা প্রাণ বলি হলো।

কমরেড ফিরোজ দমন-পীড়নের পথ পরিহার করে আন্দোলনকারীদের দাবি মেনে, হামলা ও হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িতদের গ্রেপ্তার ও বিচার করে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার দাবি জানান। অন্যথায় সকল ব্যর্থতার দায় কাঁধে নিয়ে পদত্যাগ করে ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান।

হল হোস্টেলসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দাও ছাত্রলীগ-যুবলীগ সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার ও বিচার কর

১৭ জুলাই ২০২৪

আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের উপর সরকার ছাত্রলীগ-যুবলীগের সন্ত্রাসী ও পেটোয়া পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে হামলা-মামলা, খুন করার পর সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে হল-হোস্টেল ত্যাগের নির্দেশের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন বাসদ সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ।

কমরেড ফিরোজ বলেন, পত্রিকা গণমাধ্যমে অস্ত্রসহ হামলার ছবি ছাপানোর পরও ছাত্রলীগ-যুবলীগ সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার না করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার অপচেষ্টা করছে সরকার। সরকারের দমন-পীড়নে বিরুদ্ধে সারাদেশে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা রাস্তায় আন্দোলনে সোচ্চার রয়েছে, ছাত্রলীগ আজও নির্বিচারে হামলা এবং পুলিশ টিয়ার সেল-গুলি চালিয়েছে। সরকার সম্পূর্ণ গণবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে তাই বল প্রয়োগ করে ক্ষমতায় টিকে থাকাই তার একমাত্র অবলম্বন।

আপিল বিভাগের রায়ের অস্পষ্টতা দূর করুন, দমন-পীড়ন বন্ধ করুন

২১ জুলাই ২০২৪

কোটা সংস্কার নিয়ে আপিল বিভাগের রায়ের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ বলেছেন, এই রায় কোটা সংস্কারের দাবিতে গড়ে ওঠা 'বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের' দাবির যৌক্তিকতা প্রমাণিত হয়েছে।

পাশাপাশি রাজনৈতিক সংকট আদালতের মাধ্যমে সমাধান হবে না উল্লেখ করে তিনি কারফিউ প্রত্যাহার, হত্যা, দমন-পীড়ন বন্ধ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়ার দাবি করেছেন। একই সাথে দেড় শতাধিক ছাত্র-জনতা হত্যার দায়ে শেখ হাসিনা সরকারের পদত্যাগের দাবি জানিয়েছেন। শেখ হাসিনা সরকার সম্পূর্ণ গণবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

কারফিউ তুলে নিন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দিন, গণগ্রেপ্তার বন্ধ করুন

২৫ জুলাই ২০২৪

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ ২৫ জুলাই এক বিবৃতিতে কারফিউ তুলে নিয়ে জনজীবনে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার দাবি জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে তিনি স্কুল-কলেজের নিরীহ শিক্ষার্থীসহ হাজার হাজার বিরোধী রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের গণগ্রেপ্তার করে জনমনে ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টির তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে অবিলম্বে গণগ্রেপ্তার বন্ধ করে গ্রেপ্তারকৃতদের মুক্তি দাবি করেন।

বিবৃতিতে কমরেড ফিরোজ ছাত্রদের দাবি মেনে নিয়ে অবিলম্বে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দেয়া, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কদের নির্যাতন বন্ধ, নিরাপত্তা নিশ্চিত ও শিক্ষাঙ্গনে ছাত্রলীগের সন্ত্রাস দখলদারিত্ব বন্ধ করে গণতান্ত্রিক ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠার দাবি জানান।

বিবৃতিতে উদ্ভূত রাজনৈতিক সংকটের জন্য সরকারের ব্যর্থতাকে দায়ী করে হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী শেখ হাসিনা সরকারকে পদত্যাগ করে সংকটের রাজনৈতিক সমাধানের দাবি জানানো হয়।

শিক্ষার্থীদের 'মার্চ ফর জাস্টিস' কর্মসূচিতে সারাদেশে হামলা ও গ্রেফতারের ঘটনায় নিন্দা

৩১ জুলাই ২০২৪

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক বজলুর রশীদ ফিরোজ ৩১ জুলাই সংবাদপত্রে দেওয়া এক বিবৃতিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন আহুত 'মার্চ ফর জাস্টিস' কর্মসূচিতে স্বতঃস্ফূর্ত ছাত্র জনতার উপর নির্মম পুলিশি হামলা ও গ্রেপ্তারের ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, আজ শিক্ষার্থীরা যখন সারা দেশে শান্তিপূর্ণভাবে তাদের আন্দোলন কর্মসূচি পালন করছিল সে সময় ঢাকায় হাইকোর্টের সামনে, দোয়েল চত্বরে হামলে পড়ে পেটোয়া বাহিনী পুলিশ। সেখান থেকে বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থীকে গ্রেপ্তার করে। এসময় শিক্ষার্থীদের বাঁচাতে গিয়ে আহত হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের শিক্ষক শেহরীন আমিন মোনামী। এছাড়া বরিশালে আন্দোলনে হামলা করে অনেক শিক্ষার্থীকে আহত করে এবং প্রায় ২০ জনকে গ্রেপ্তার করে; হামলা ও গ্রেপ্তার করে সিলেট এবং খুলনাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে। খুলনায় ৫৬ জন শিক্ষার্থীকে গ্রেপ্তার করে।

বাসদ সাধারণ সম্পাদক হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, এভাবে হামলা-গ্রেপ্তার করে এই জনজোয়ার বন্ধ করা যাবে না। আন্দোলনকে দমন করতে পারবে না সরকার। অবিলম্বে শেখ হাসিনা সরকার পদত্যাগ করে এই সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের আহ্বান জানান তিনি।

কালবিলম্ব না করে শেখ হাসিনা সরকার পদত্যাগ করুন

২ অগাস্ট ২০২৪

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ ২ আগস্ট সংবাদপত্রে দেওয়া এক বিবৃতিতে 'ছাত্র জনতার গণমিছিল' কর্মসূচিতে খুলনা, সিলেট, ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পুলিশি হামলা ও গুলির ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, ছাত্র জনতার গণমিছিলের এই কর্মসূচিতে সারা দেশে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার হাজার হাজার মানুষ পথে নেমে এসেছে। সবার কণ্ঠে একই স্লোগান, 'এই খুনি সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে, ভাই হত্যার বিচার করতে হবে'। কিন্তু দেখা গেল সরকার পূর্বের ন্যায় আবারও জনতার গণরায়কে আমলে না নিয়ে দমন পীড়নের পথেই হাঁটছে। আজও খুলনা, সিলেট, হবিগঞ্জ, ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে আন্দোলনরত জনতার উপর হামলা করেছে, গুলি বর্ষণ করেছে। অনেক মানুষ হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। অব্যাহতভাবে এই দমন পীড়ন করে সরকার কোনভাবেই নিজেদের রক্ষা করতে পারবে না বরং বিস্ফোরণকে আরও বেশি উসকে দেবে।

কমরেড ফিরোজ আরও বলেন, সরকারের উচিত কালবিলম্ব না করে পদত্যাগ করে দেশের মানুষের এই গণরায়কে মেনে নেয়া এবং সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করার ।

এখনই পদত্যাগ করে অন্তবর্তী সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করুন

বাম দলসমূহ, ৪ আগস্ট

বাম গণতান্ত্রিক জোট, ফ্যাসিবাদ বিরোধী বাম মোর্চা ও বাংলাদেশ জাসদ নেতৃবৃন্দের এক সভা ৪ আগস্ট সিপিবি কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। বাম গণতান্ত্রিক জোটের সমন্বয়ক ও বাসদের সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন সিপিবির সভাপতি মো. শাহ আলম, সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স, বাসদের সহকারী সাধারণ সম্পাদক রাজেকুজ্জামার রতন, বাংলাদেশ জাসদ এর স্থায়ী কমিটির সদস্য ডা. মুশতাক হোসেন, বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক ইকবাল কবির জাহিদ, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টি সাধারণ সম্পাদক মোশরেফা মিশু, বাসদ (মার্কসবাদী) সমন্বয়ক মাসুদ রানা, সমাজতান্ত্রিক পার্টির রুবেল সিকদার; ফ্যাসিবাদ বিরোধী বাম মোর্চার সমন্বয়ক ও নয়াগণতান্ত্রিক গণমোর্চার সভাপতি জাফর হোসেন, সাম্যবাদী আন্দোলনের বেলাল চৌধুরী, গণমুক্তি ইউনিয়নের আহ্বায়ক নাসির উদ্দিন নাসু, জাতীয় গণতান্ত্রিক গণমঞ্চের সভাপতি মাসুদ খান, বাসদ (মাহবুব) মহিন উদ্দিন চৌধুরী লিটনসহ পরিচালনা পরিষদের নেতৃবৃন্দ।

সভার এক প্রস্তাবে আজও সারা দেশে ছাত্র জনতার উপর পুলিশ ও ছাত্রলীগ-যুবলীগ-আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসী হামলা ও গুলিবর্ষণে প্রায় শতাধিক প্রাণহানির ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ ও উদ্বেগ প্রকাশ করে বলা হয়, সরকার পদত্যাগ করতে যতই বিলম্ব করছে প্রাণহানিসহ জানমালের ক্ষয়ক্ষতি ততই বাড়ছে। নেতৃবৃন্দ এখনই শেখ হাসিনা সরকারকে পদত্যাগ করে অন্তবর্তী সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের জোর দাবি জানান।

আন্দোলনের দিনগুলি

আন্দোলনে পুলিশ ও আওয়ামী সন্ত্রাসীদের নৃশংসতা

ছাত্র-জনতার প্রতিরোধ

পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে রাজপথে হাজারো ছাত্র-জনতার ঢল

কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে লাখো জনতার সমাবেশ

৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে 'গণভবন' ছাত্র-জনতার দখলে

প্রেসক্লাব-পল্টনে ছাত্র-জনতার সমাবেশ

রাজপথে প্রতিরোধের আগুন

ছাত্র-জনতার সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন ছাত্র ফ্রন্ট ময়মনসিংহ জেলার সভাপতি আব্দুল্লাহ আল নাকিব

৫ আগস্ট জাতীয় সংসদ ভবনের চারপাশে বিজয়ী জনতার উল্লাস

সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন ছাত্র ফ্রন্ট রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি রিনা মুরমু

ছাত্র-জনতার সমাবেশে স্লোগানরত ছাত্র ফ্রন্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতা অদিতি ইসলাম

সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন ছাত্র ফ্রন্ট জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতা সোহাগী সামিয়া

সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন ছাত্র ফ্রন্ট বগুড়া জেলার সভাপতি নিয়তি সরকার নিতু

সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন ছাত্র ফ্রন্ট নারায়ণগঞ্জ জেলার সাধারণ সম্পাদক নাসিমা সরদার

‘কমপ্লিট শাটডাউন’ কর্মসূচির প্রতি বাম জোটের সমর্থন দেশবাসীকে সফল করার আহ্বান

বাম গণতান্ত্রিক জোট

বাম গণতান্ত্রিক জোট কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদের সমন্বয়ক ও বাসদের সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ সিপিবির সভাপতি কমরেড শাহ আলম, সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স, বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক কমরেড ইকবাল কবির জাহিদ, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড মোশরেফা মিশু, বাসদ (মার্কসবাদী) সমন্বয়ক মাসুদ রানা ও বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টির নির্বাহী সভাপতি আব্দুল আলী ১৭ জুলাই সংবাদপত্রে দেয়া এক বিবৃতিতে ছাত্র হত্যার বিচার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দেয়া ও কোটার যৌক্তিক সংস্কারের দাবিতে ‘বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন’ এর ডাকা আগামীকাল ১৮ জুলাই সারাদেশে ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ কর্মসূচির প্রতি সর্বাত্মক সমর্থন জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ আগামীকালের ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ কর্মসূচি সফল করতে সারাদেশের ছাত্র-শ্রমিক, কৃষক, নারীসহ সর্বস্তরের গণতন্ত্রকামী দেশপ্রেমিক জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন।

ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের হামলার প্রতিবাদে সমাবেশ ও মিছিল অস্ত্র হাতে ছবি ছাপা হওয়ার পরও গ্রেপ্তার না হওয়ায় ক্ষোভ

ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও ইডেন কলেজসহ সারাদেশে হামলা, এমনকি হামলায় আহতরা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে গেলে সেখানেও ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের হামলার প্রতিবাদে বাম গণতান্ত্রিক জোটের উদ্যোগে ১৬ জুলাই ঢাকায় সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত। সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, প্রধানমন্ত্রী, সেতুমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উসকানিমূলক বক্তব্যে নির্দেশিত হয়ে এই হামলা সংগঠিত হয়েছে। প্রকাশ্যে অস্ত্র হাতে হামলার ছবি গণমাধ্যমে প্রকাশের পরও সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার না করায় ক্ষোভ প্রকাশ করে নেতৃবৃন্দ ‘কোটা’ সংস্কারের ন্যায্য আন্দোলন দমনে সরকারের এই সন্ত্রাসী পদক্ষেপ ও সন্ত্রাসীদের রুখে দাঁড়াতে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

নেতৃবৃন্দ বলেন, মুক্তিযুদ্ধকে বিতর্কিত করার চেষ্টা আর আন্দোলনকে মুক্তিযুদ্ধের বিপরীতে দাঁড় করানোর এই অপচেষ্টা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। মুক্তিযুদ্ধ জাতির গর্বিত অর্জন, মুক্তিযোদ্ধারা শ্রেষ্ঠ সন্তান, একে বিতর্কিত করা যাবে না, সরকার মুক্তিযুদ্ধের নামে ব্যবসা করছে এবং সরকারের দুর্নীতি, দুঃশাসন-লুটপাট, অর্থপাচার এর বিরোধীতা করলে এবং ছাত্র-জনতা তাদের অধিকারের দাবি করলে তাদেরকে ‘রাজাকার’ ট্যাগ লাগিয়ে গণআন্দোলন দমন করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে।

নেতৃবৃন্দ ঐক্যবদ্ধভাবে সরকারের অপচেষ্টে মোকাবিলার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

কারফিউ প্রত্যাহার, সেনাবাহিনী-বিজিবি সদস্যদের প্রত্যাহার শেখ হাসিনা সরকারের পদত্যাগ দাবি

বাম-গণতান্ত্রিক দলসমূহ

বাম গণতান্ত্রিক জোট, বাংলাদেশ জাসদ, ফ্যাসিবাদ বিরোধী বাম মোর্চার কেন্দ্রীয় এক সভা ২৩ জুলাই সিপিবি কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

সভার প্রস্তাবে অবিলম্বে কারফিউ প্রত্যাহার, সেনা ও বিজিবি সদস্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়া, জীবন-যাত্রা স্বাভাবিক করতে অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়া, ইন্টারনেটসহ জরুরি সেবা চালু, রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবু সাঈদসহ ৩ শতাধিক ছাত্র হত্যার বিচার, আন্দোলনকারী ছাত্রদের নিরাপত্তা নিশ্চিত, নিহত-আহতদের ক্ষতিপূরণ প্রদান, আন্দোলনকারী নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তার বন্ধ করে শেখ হাসিনা সরকারের পদত্যাগের জোর দাবি জানানো হয়। সভার অপর এক প্রস্তাবে ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক নাহিদ ইসলামসহ আন্দোলনকারী ছাত্রদের উপর নির্যাতন, বিরোধী ছাত্র-জনতা ও রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের গণগ্রেপ্তার, দমন-পীড়নের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলা হয় সরকার ফ্যাসিবাদী শাসন ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী করতে চলমান সংকট সৃষ্টির মূল কারণ ও তার গভীরতা অনুধাবন করে সমাধানের পথে না গিয়ে ঘটনার একতরফা বয়ান গণমাধ্যমসহ নানাভাবে প্রচার করেছে। সরকারের এই গোয়েবলসীয় মিথ্যা ভাষণ জনগণ গ্রহণ করছে না।

বাম গণতান্ত্রিক জোট কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদের সমন্বয়ক ও বাসদের সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন সিপিবি’র সভাপতি কমরেড শাহ আলম, সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স, বাসদের সহকারী সাধারণ সম্পাদক রাজেকুজ্জামান রতন, বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক ইকবাল কবির জাহিদ, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশরেফা মিশু, বাসদ (মার্কসবাদী) সমন্বয়ক মাসুদ রানা, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টির নির্বাহী সভাপতি আব্দুল আলী; বাংলাদেশ জাসদ এর সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক প্রধান, ফ্যাসিবাদবিরোধী বাম মোর্চার সমন্বয়ক ও নয়া গণতান্ত্রিক গণমোর্চার সভাপতি জাফর হোসেন, বাংলাদেশের সাম্যবাদী আন্দোলনের সদস্য বেলাল চৌধুরী, গণমুক্তি ইউনিয়নের আহ্বায়ক নাসির উদ্দিন আহমেদ নাসু, বাসদ (মাহবুব) এর মইনুদ্দীন চৌধুরী লিটন, জাতীয় গণতান্ত্রিক গণমঞ্চের সভাপতি মাসুদ খান।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বাম গণতান্ত্রিক জোট, বাংলাদেশ জাসদ, ফ্যাসিবাদ বিরোধী বাম মোর্চার নেতৃবৃন্দ

আহতদের সুচিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে

নিহত-আহতদের তালিকা প্রকাশ ও হত্যাকারীদের বিচার দাবি

বাম গণতান্ত্রিক জোট, ফ্যাসিবাদ বিরোধী বাম মোর্চা এবং বাংলাদেশ জাসদ এর নেতৃবৃন্দ ২৮ জুলাই বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনকারীদের উপর আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নির্বিচার গুলিবর্ষণ ও নির্যাতনে আহতদের খোঁজ খবর নিতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গিয়েছিলেন।

নেতৃবৃন্দ ঢাকা মেডিকেল কলেজের পরিচালকের সঙ্গে দেখা করে চিকিৎসাধীন আহতদের চিকিৎসার বিষয়ক খোঁজখবর নেন এবং হাসপাতালে বিভিন্ন ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন আহতদের চিকিৎসা নিয়ে কথা বলেন।

নেতৃবৃন্দ আহতদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ, চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানান।

হাসপাতালে এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাম গণতান্ত্রিক জোট এর সমন্বয়ক ও বাসদের সাধারণ সম্পাদক বজলুর রশীদ ফিরোজ, সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্সসহ, নাজমুল হক প্রধান, শুভ্রাংশু চক্রবর্তী, রাজেকুজ্জামান রতন, মিহির ঘোষ, ইকবাল কবির জাহিদ, ডা. মুশতাক হোসেন, মোশরেফা মিশু, মাসুদ রানা, জাফর হোসেন, নাসির উদ্দিন নাসু, মহিন উদ্দিন চৌধুরী লিটন, ডা. হারুন অর রশীদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

নেতৃবৃন্দ বলেন, এ সরকার মানুষকে খুন করে, নিপীড়ন-নির্যাতন চালিয়ে ফ্যাসিবাদী কায়দায় ক্ষমতায় থাকতে চায়। মানুষের জীবন তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়, লাশের উপর দাঁড়িয়ে, গ্রেপ্তার করে-মামলা দিয়ে মানুষের কণ্ঠ স্তব্ধ করতে চায়। বস্তুত, সরকারের বিদায় ঘণ্টা বেজে গেছে, জনতার জয় সময়ের ব্যাপার মাত্র।

প্রকৌশলী শেখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর মৃত্যুতে শোক

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ ৯ আগস্ট গণমাধ্যমে দেওয়া এক বিবৃতিতে তেল-গ্যাস-খনিজসম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষার জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক প্রকৌশলী শেখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর মৃত্যুতে গভীর শোক ও পরিবারের সদস্য, আত্মীয়স্বজন শুভাকাঙ্ক্ষীসহ সকলের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেছেন।

কমরেড ফিরোজ বলেন, প্রকৌশলী শেখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ছিলেন জাতীয় সম্পদ রক্ষা ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের এক অগ্রসৈনিক। দেশের তেল-গ্যাস-খনিজসম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষার আন্দোলনের আহ্বায়ক হিসেবে দীর্ঘদিন তিনি নেতৃত্বের ভূমিকায় থেকে দায়িত্ব পালন করেছেন। আন্দোলনে ব্যাপক মানুষকে যুক্ত করেছেন। তিনি সমাজ বদলের লড়াইয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

কমরেড ফিরোজ আরও বলেন, প্রকৌশলী শেখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর মৃত্যুতে দেশ একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক সাহসী যোদ্ধাকে হারালো।

বিবৃতিতে তিনি তাঁর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

কমরেড আব্দুল লতিফের মৃত্যুতে শোক

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ ১০ আগস্ট গণমাধ্যমে দেওয়া এক বিবৃতিতে বাসদ গাজীপুর জেলা কমিটির সদস্য, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সদস্য ও গাজীপুর জেলা শাখার সভাপতি কমরেড আব্দুল লতিফের মৃত্যুতে গভীর শোক ও পরিবারের সদস্য, আত্মীয়স্বজন শুভাকাঙ্ক্ষীসহ সকলের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেছেন।

কমরেড ফিরোজ বলেন, কমরেড আব্দুল লতিফ সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, পরবর্তীতে বাসদ ও শ্রমিক ফ্রন্ট গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি দলের যে কোনো সংকটে দলের ন্যায়নিষ্ঠ অবস্থানের সাথে থেকে লড়াই করেছেন।

কমরেড ফিরোজ আরও বলেন, তার মৃত্যু শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণি একজন বিশ্বস্ত সহযোদ্ধাকে হারালো। উল্লেখ্য করোনা পরবর্তী কিডনি রোগে ভুগছিলেন তিনি। কমরেড ফিরোজ তাঁর অসমাপ্ত কাজ এগিয়ে নেওয়ার জন্য দলের সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানান।

কমরেড লতিফের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি কমরেড রাজেকুজ্জামান ও সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবিব বুলবুল। কমরেড আব্দুল লতিফ লাল সালাম ।

আন্দোলনের দিনগুলি

আলোচনার প্রস্তাব দিয়ে অকাতরে মানুষ হত্যা করেছে সরকার

সকল হত্যাকাণ্ডের দায় নিয়ে অবিলম্বে পদত্যাগ করুন

বাম গণতান্ত্রিক জোট

আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের উপর অব্যাহত হামলা, হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী পুলিশ-ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার এবং বিচার, সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হল-হোস্টেল অবিলম্বে খুলে দেয়া, স্বাধীন কমিশন গঠন করে সকলের মতামত নিয়ে কোটা ব্যবস্থার যৌক্তিক সংস্কারের দাবিতে বাম গণতান্ত্রিক জোটের পূর্বঘোষিত কর্মসূচি ১৮ জুলাই '২৪ জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অনুষ্ঠিত হয়। বাম জোটের কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক বাসদের সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজের সভাপতিত্ব অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স, বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক ইকবাল কবির জাহিদ, বাসদ (মার্কসবাদী) সমন্বয়ক মাসুদ রানা, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টি সাধারণ সম্পাদক মোশরেফা মিশু ও সমাজতান্ত্রিক পার্টি নির্বাহী সভাপতি আব্দুল আলী।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, দেশকে এক চরম নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিয়েছে সরকার। কোটা ব্যবস্থার সংস্কারের দাবিতে দীর্ঘ এক মাস ধরে শিক্ষার্থীরা শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করে আসছিল। অথচ সরকার তাদের এই যৌক্তিক দাবি আমলে না নিয়ে শুরু থেকেই দমন-পীড়নের পথে হেটেছে। ছাত্রলীগ-পুলিশ বাহিনী দিয়ে হামলা করিয়েছে। শিক্ষার্থীদের রক্ত ঝরিয়েছে। মৃত্যুর সংখ্যা উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে হাজার হাজার শিক্ষার্থী আহত হয়েছে। ছাত্রদের পাশাপাশি বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ রাজপথে নেমে এসেছে। ছাত্রলীগ-যুবলীগের সন্ত্রাসীদের প্রতিরোধ করেছে। পুলিশ বাহিনীর সশস্ত্র আক্রমণ বুক পেতে দিয়ে মোকাবিলা করেছে। এক অভূতপূর্ব লড়াইয়ের নজির বাংলাদেশের ছাত্রসমাজ সৃষ্টি করেছে। সরকার এখন উপায়ান্তর না দেখে আলোচনার সুর তুলছেন। গতকালও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির উদ্দেশ্যে বক্তব্য রেখেছেন। সেখানেও আলোচনা কিংবা শিক্ষার্থীদের দাবির বিষয় আমলে নিয়ে কোন কথা বলেননি। যার ফলে আমরা দেখি আজ সকাল থেকেই ঢাকাসহ সারা দেশে প্রায় ৪০ জন মানুষের প্রাণহানি ঘটল। আজ দুপুরে আইনমন্ত্রী আলোচনার প্রস্তাব দিয়ে বলেছেন, আন্দোলনকারীরা যখন চায় তখনি সরকার আলোচনায় বসতে চায়। একেই বলে 'গাধা পানি ঘোলা করে খায়' তেমন পরিস্থিতি।

নেতৃবৃন্দ বলেন, একদিকে এই আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছেন আবার একই সাথে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ছাত্রলীগ-যুবলীগ কর্মীদের নির্দেশনা দিচ্ছেন শক্ত হাতে সাহসিকতার সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য। আবার আলোচনার কথা বলে এখনও বিভিন্ন জায়গায় শিক্ষার্থীদের উপর গুলি বর্ষণ ও ৩৩ জনকে হত্যা করা হচ্ছে। এ থেকেই বুঝা যায় সরকার আলোচনার জন্য আন্তরিক নয়। তাই এই আলোচনার জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করতে হলে এই মুহূর্তেই শিক্ষার্থীদের উপর সকল ধরণের আক্রমণ বন্ধ করতে হবে। সরকার দলীয় সন্ত্রাসীদের মাঠ থেকে তুলে নিয়ে পুলিশ-বিজিবি, র‍্যাব ইত্যাদি বাহিনীকে প্রত্যাহার করতে হবে, গণমাধ্যমে প্রকাশিত অস্ত্রহাতে গুলি করতে দেখা যাওয়া ছাত্রলীগ-যুবলীগ ও পুলিশ সদস্যদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে, সকল হত্যাকাণ্ডের বিচারে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করতে হবে। ছাত্রদের নামে দায়ের করা মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। অবিলম্বে সকল স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও আবাসিক হল-হোস্টেল খুলে দিতে হবে। প্রকাশ্যে হত্যাকাণ্ডের দায় স্বীকার ও কোটা সংস্কারের ঘোষণা দিতে হবে। এসকল কাজ সম্পন্ন না করে আলোচনা কখনই অর্থবহ হবে না।

নেতৃবৃন্দ জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বলেন, সকলে রাজপথে নেমে আসুন। এই ভোটারবিহীন ফ্যাসিস্ট সরকার আমাদের সন্তানদের রক্তে নিজেদের হাত রঞ্জিত করেছে। একে উচ্ছেদ করে যাদের উস্কানিতে এই সংকট ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সংগঠিত হয়েছে তাদের হুকুমের আসামি করার দাবি জানান।

নিহত-আহতদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ কর

শ্রমজীবীসহ প্রতিটি হত্যার বিচার, ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন নিশ্চিত কর

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে সহিংসতায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও আওয়ামী সন্ত্রাসীদের নিপীড়ন ও পাল্টা হামলায় সারাদেশে ছয় শতাধিক মানুষের জীবনহানি, হাজারো মানুষের পঙ্গুত্ব, মারাত্মক আহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে যাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ শ্রমজীবী মানুষ। গণ অভ্যুত্থানের পূর্বে মৃতদেহ ময়নাতদন্ত বা রেকর্ড সংরক্ষণ ছাড়াই সৎকার করা হয়েছে। ফলে, অনুসন্ধানের মাধ্যমে নিহত ও আহতদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরি করা না হলে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমজীবী পরিবারগুলি বিচার ও ক্ষতিপূরণ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হবে। এই প্রেক্ষিতে, পরিবহন শ্রমিক, রিকশা চালক, হোটেল ও পর্যটন কর্মী, হকার, গার্মেন্টস ও টেক্সটাইল কর্মী, নির্মাণ শ্রমিক, ক্যামিকেল শিল্পের শ্রমিক, দিনমজুরসহ প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের সকল শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের জোট 'জাতীয় শ্রমিক-কর্মচারী আন্দোলন' শ্রমজীবীসহ নিহত ও আহতদের তালিকা প্রকাশ, প্রতিটি হত্যার বিচার, নিহত-আহতদের ক্ষতিপূরণ, সুচিকিৎসা ও পুনর্বাসন, সকল শ্রমিকদের কারফিউ ও সাধারণ ছুটির সময়ের পূর্ণ মজুরি এবং চাকরির নিশ্চয়তা নিশ্চিত করার দাবিতে ৯ আগস্ট জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ ও মিছিল করে।

শ্রমিকনেতা আব্দুল কাদেরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সমাবেশ পরিচালনা করেন গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্টের সহসভাপতি খালেকুজ্জামান লিপন। বক্তব্য রাখেন সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবিব বুলবুল, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র (টিইউসি) এর নির্বাহী কমিটির সদস্য কাজী রুহুল আমিন, বাংলাদেশ গার্মেন্ট ও সোয়েটার শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সহসভাপতি হাফিজুল ইসলাম, রি-রোলিং ও স্টিল মিলস শ্রমিক ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক আবু নাঈম খান বিপ্লব, টেক্সটাইল শ্রমিক নেতা জিয়াউর রহমান, বাংলাদেশ ট্যুরিজম এন্ড হোটেলস ওয়ার্কার্স এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের যুগ্ম আহবায়ক মহিউদ্দিন আহমেদ রিমেল, ক্যামিকেল শিল্পের নেতা হুমায়ুন কবির, হালকাযান ড্রাইভার ইউনিয়নের যুগ্ম সম্পাদক রফিকুল ইসলাম রফিক, রিকশা-ভ্যান, ব্যাটারি রিকশা ও ইজিবায়িক চালক সংগ্রাম পরিষদের ঢাকা নগরের আহবায়ক জালাল আহমেদ, পরিবহন শ্রমিক ফ্রন্টের মোহাম্মদ সেলিম প্রমুখ।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, ১৬ জুলাই থেকে আন্দোলনে হতাহত মানুষের সঠিক হিসাব আমরা জানি না। নিহত এবং আহতদের মধ্যে শিশু-কিশোর, শিক্ষার্থী ছাড়াও রয়েছে হোটেল ও পর্যটন কর্মী, গাড়িচালক, রিকশা চালক, হকার, গার্মেন্টস ও টেক্সটাইল কর্মী, নির্মাণ ও ক্যামিকেল শ্রমিক, দোকান কর্মচারী, দিনমজুরসহ অসংখ্য শ্রমজীবী মানুষ। নিহত এবং আহতদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ শ্রমজীবী মানুষ। পরিবারের প্রধান উপার্জনকারী এই শ্রমজীবী মানুষের মৃত্যু, আহত, গ্রেপ্তার পুলিশি নির্যাতনে অসুস্থ হয়ে যাওয়ায় অসহায় হয়ে পড়েছে তাদের পরিবার। অনুসন্ধানপূর্বক নিহত ও আহতদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরি নাহলে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমজীবীদের পরিবার ন্যায়বিচার এবং ক্ষতিপূরণ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হবে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, এখনো গ্রেপ্তারকৃত সকল শ্রমজীবী মানুষ মুক্তি পায়নি, অবিলম্বে তাদের মুক্তি ও মামলা প্রত্যাহার করতে হবে, দায়িদের শাস্তি প্রদান, নিহতদের পরিবারকে যথাযোগ্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, আহতদের বিনামূল্যে চিকিৎসা ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করতে হবে। সাধারণ ছুটির সময়ের পূর্ণ মজুরি প্রদান করতে হবে। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমজীবীদের কর্মসংস্থান না থাকায় প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানান।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, আওয়ামী সরকার পুলিশ, শিল্প পুলিশ, কল-কারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রম দপ্তরসহ প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে দুর্নীতিগ্রস্ত করেছে ও মালিকদের স্বার্থ রক্ষার ভাড়াটিয়া হিসেবে ব্যবহার করেছে। শ্রমিকদের শ্রম আইনের স্বীকৃত অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার অধিকার ট্রেড ইউনিয়ন। নীতি নির্ধারণী ক্ষেত্রে শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হয়নি, বিভিন্ন কাঠামোয় শ্রমিক প্রতিনিধির মতামত প্রদানের সুযোগ ছিল না। দেশের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে এই সকল অব্যবস্থাপনা সমূলে উৎপাটন করতে হবে।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, শ্রমজীবী ও তাদের প্রতিনিধি শ্রমিক নেতাদের পরামর্শ-মতামত নেওয়া ছাড়া সমাজ গণতান্ত্রিক হবে না। অন্তর্বর্তী সরকারকে শ্রমিকদের সমস্যার কথাও শুনতে হবে। শ্রম আইনকে গণতান্ত্রিক করতে হবে। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার প্রতিশ্রুতি আলোকে শ্রমজীবীদের মানবিক মর্যাদাসম্পন্ন উন্নত জীবন নিশ্চিত করতে এবং তাদের সমস্যার কথা শুনতে নীতি নির্ধারণী প্রতিটি পর্যায়ে শ্রমজীবী মানুষের গণতান্ত্রিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। স্বাধীনভাবে যৌথ দরকষাকষির মাধ্যমে ভারসাম্যপূর্ণ শিল্প সম্পর্কের চর্চার সংস্কৃতি গড়ে তোলা, বৈষম্য মুক্ত সমাজ গড়ার পথে এগিয়ে যাওয়ার অন্যতম শর্ত।

নেতৃবৃন্দ, আগস্ট মাসব্যাপী সারাদেশের বিভিন্ন জেলা ও শিল্পাঞ্চলে সামাবেশ, মিছিল, মানববন্ধনসহ প্রচারমূলক কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমজীবীদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও সংগঠনের নেতা-কর্মীদের প্রতি আহবান জানান।

জীবন, রক্ত আর চোখের জলে বৈষম্য অবসানের স্বপ্ন

১৫ পৃষ্ঠার পর

করা হয়েছিল যা আগে কখনো হয় নাই। এসব প্রতিষ্ঠান ভয়াবহ দুর্নীতি এবং দমন-পীড়নের সংস্থায় পরিণত হয়েছিল। যোগ্যরা বিতাড়িত অথবা মাথা নিচু করে থেকেছে আর দলীয় ব্যক্তিরা দুর্বিনীত হয়ে উঠেছিল। লুটপাট হয়েছে সীমাহীন। ফলে সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের উপর মানুষ আস্থা হারিয়েছে। পুলিশ এবং প্রশাসন তো বটেই বিচার বিভাগও প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। বলা হয় বিচার বিভাগ স্বাধীন, কিন্তু মানুষ দেখেছে আওয়ামী লীগের অধীনে স্বাধীন! আওয়ামী লীগ যেভাবে চেয়েছে, বিচার কাজ সেভাবেই চলেছে। কাউকে জামিন দেয়া বা শাস্তি দেয়া ক্ষমতাসীন দলের অভিপ্রায়ের উপর নির্ভর করতো। ফলে এখানে বড় ধরনের সংস্কার আনা অপরিহার্য। তা না হলে মানুষের আস্থা ফিরবে না।

দেশে প্রশাসন বলতে মানুষ বুঝেছে দলীয় শাসন চালাবার সরকারি প্রতিষ্ঠান। সেটা সব সরকারের আমলেই কমবেশি ছিল। কিন্তু আওয়ামী লীগ শাসনমলে আমলাদের মনোভাবের নিম্নমুখী পরিবর্তন ঘটেছিল। আগে আমলাদের বৈশিষ্ট্য ছিল তারা যখন যে সরকার থাকতো তখন সেই সরকারের অনুগত থেকে কাজ করতেন এবং নানা ধরনের ব্যক্তিগত সুবিধা নিতেন। কিন্তু গত ১৫ বছরে তা পালটে গিয়ে আমলারা তারা নিজেরাই ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ এর নেতা হয়ে গিয়েছে। ফলে প্রশাসনিক লাঠিয়াল হিসেবে তারা যেমন নিপীড়ন করেছেন তেমনি দুর্নীতি করেছেন অবাধে। ফলে এখানে সংস্কার ছাড়া ভবিষ্যতেও কোন গণতান্ত্রিক সরকার কাজ করতে পারবে না। প্রশাসনকে এটা মানতে বাধ্য করতে হবে যে, তারা কোনো দলের নয়, প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী এবং জনগণের সেবা প্রদানই তাদের কাজ।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় লুটপাট অনিবার্য বিষয় এটা সবাই মানে। কিন্তু গত ১৫ বছরে আর্থিক খাতে লুটপাট প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়েছিল। দেশের অর্থনীতির সবচেয়ে বেশি রক্তক্ষরণ হয়েছে অর্থ পাচারের মাধ্যমে। ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষণা সংস্থা গ্লোবাল ফাইনান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি বিশ্বের সব দেশের আর্থিক অবৈধ লেনদেন নিয়ে গবেষণা করে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। তাদের প্রতিবেদন অনুযায়ী গত ১০ বছর ধরে বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর গড়ে ৭০০ কোটি ডলার পাচার হয়েছে। তুলনা করে দেখুন, পদ্মা সেতু নির্মাণে এগার বছরে ব্যয় হয়েছে ৩.৫৬ বিলিয়ন ডলার। আর একটি উদাহরণ, আওয়ামী লীগ সরকার আইএমএফের সঙ্গে ৪.৫ বিলিয়ন ডলারের একটি ঋণচুক্তি সম্পাদন করে। সাত কিস্তিতে আইএমএফ এই ঋণ দেবে। বছরে ৭ বিলিয়ন ডলার পাচার হয়ে যাচ্ছে অন্যদিকে ৪.৫ বিলিয়ন ডলার শর্তসাপেক্ষ ঋণ নেওয়া হয়েছে। অর্থ পাচার রোধ ও পাচারকৃত অর্থ ফেরত আনতে পারলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সংকট শুধু কেটে যাবে তাই নয় বরং অনেক শক্তিশালী হবে।

দীর্ঘদিন ধরে ব্যাংক খাতে নির্বিচারে লুটপাট চলেছে। ফলে এ খাত আজ বিপর্যস্ত, ভঙ্গুর। রাজনৈতিক বিবেচনায় ঋণ দেয়ার ফলে ব্যাংক খাত দেউলিয়া হবার উপক্রম হয়েছিল। নামে বেনামে ঋণ নিয়ে ব্যাংকগুলোকে রুগ্ন বানিয়ে ফেলা হয়েছে, ঋণ নিয়ে শোধ না দেয়া যেন নিয়মে পরিণত হয়েছিল ফলে সরকারি হিসাবমতেই আজ পর্যন্ত ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ১ লাখ ৮৬ হাজার কোটি টাকা। কিন্তু সংশ্লিষ্টদের মতে প্রকৃত হিসাবে ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৪ লাখ কোটি টাকার কম নয়। এই অনাচার বন্ধ এবং খেলাপি হওয়া অর্থ উদ্ধার করে সাধারণ মানুষের ব্যাংক আমানতের নিরাপত্তা দিতে হবে।

বিগত ১৫ বছরে সবচেয়ে বেশি আলোচিত এবং সরকারের পক্ষ থেকে প্রশ্রয়প্রাপ্ত বিষয় ছিল দুর্নীতি। মেগা প্রকল্প, নিয়োগ, প্রমোশন, বদলি, নির্মাণ ও কেনাকাটার মাধ্যমে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে। শিক্ষা, চিকিৎসাসহ সকল খাত এবং গ্রামের হাটবাজারের ইজারা থেকে শুরু করে সচিবালয়ে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত দুর্নীতি ছিল প্রকাশ্য এবং বেপরোয়া। উচ্চপদের বেনজীর-মতিউর থেকে নিম্নপদের আবেদ আলীরাই শুধু নয় প্রধানমন্ত্রীর পিয়ন পর্যন্ত ৪০০ কোটি টাকার মালিক হয়ে গিয়েছিল। ক্ষমতার সাথে দুর্নীতির এই মেলবন্ধন ছিন্ন করা এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি যেমন দরকার। তেমনি দরকার দুর্নীতির কাঠামোগত পথ বন্ধ করা। দুর্নীতির রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার সংস্কার গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো, মানুষের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা করা। এদেশের মানুষের নানা কষ্ট। ভাতের কষ্ট, কাপড়ের কষ্ট, বাসস্থানের কষ্ট, শিক্ষা-চিকিৎসা, কাজ পাওয়ার কষ্ট, কিন্তু সব ছাপিয়ে মুখ ফুটে কথা বলতে না পারার কষ্ট প্রধান হয়ে উঠেছে। ভোট দিতে না পারার কষ্টের সাথে ভুয়া ভোটে বিজয়ীদের দম্ভ ও মিথ্যাচার মানুষকে চূড়ান্তভাবে অপমান করেছে। শেখ হাসিনা ক্ষমতার পালাবদলের চেয়ে পছন্দ করেছিলেন ক্ষমতার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালে প্রহসনমূলক নির্বাচনের ফলে নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচনী ব্যবস্থা আস্থা হারিয়েছে। যে কারণে ভোটের সময় মানুষ আর ভোট কেন্দ্রে যেতে চাইত না। সুষ্ঠু নির্বাচন চাইলে সংস্কার দরকার এখানেও। গণঅভ্যুত্থানের আগে মানুষ চেয়েছিল ফ্যাসিবাদী সরকারের পতন, এখন চায় ব্যবস্থার পরিবর্তন। জীবন ও রক্ত দিয়ে হাসিনা শাসন উচ্ছেদ করেছে এখন মানুষ দেখতে চায় গণতান্ত্রিক শাসন।

দুর্নীতি ও লুটপাটের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মানুষ আশা করে জবাবদিহিতা। দেখতে চায় বৈষম্যের অবসান। দেশে আর যেন কোনো সরকার ফ্যাসিস্ট ও দুর্নীতিবাজ হতে না পারে সেই ব্যবস্থা ও সংস্কৃতি গড়ে তোলার কাজটাই এখন জরুরি। তার জন্য প্রয়োজন আকাঙ্ক্ষাকে জাগিয়ে রাখা আর আন্দোলনকে জারি রাখা।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন–পটভূমি, সংগ্রাম আর ভবিষ্যতের আশা

পঞ্চম পৃষ্ঠার পর

ঘটল? শুধু দোষারোপের খেলা বা বিরোধীদের ষড়যন্ত্র খোঁজার পুরনো পথে হাঁটলে প্রকৃত বিষয় আড়ালেই থেকে যাবে। এই দেশে অতীতে এমন কোন আন্দোলন কি হয়েছে যেখানে বিরোধী দলকে দোষারোপ করা বা তাদের ঘাড়ে দোষ চাপানো হয়নি? বিরোধীদের উপর দোষ চাপিয়ে দায় এড়ানোর কৌশল অনেক পুরনো। এবারও সেই চেষ্টাই শুরু থেকে করেছে সরকার।

প্রথম থেকে ছাত্ররা শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করেছে, কোনো রকম সহিংসতায় জড়ায়নি। ছাত্রদের ওপর যখন বাইরে থেকে আক্রমণ এল, তখন তাদের প্রতিবাদটাও আর অহিংস থাকেনি। আন্দোলনকে দমন করার জন্য সরকারি দলের ছাত্রসংগঠন, যুবসংগঠনকে ব্যবহার করা হয়েছে। ছাত্রদের নিয়ে উপহাস, ব্যঙ্গ ও কটূক্তি করা হয়েছে। যা ছাত্রদের মধ্যে ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। ছাত্রদের এই ক্ষোভের পেছনেও ছিল দীর্ঘদিনের বেদনা ও অপমান। গেস্টরুমের অত্যাচার, সিট বন্টনের নৈরাজ্য, ছাত্রলীগের মিছিলে-মিটিংয়ে যাওয়ার জন্য চাপ, না গেলে নানা ধরনের অত্যাচার এসব ক্ষোভ ছাত্রদের মধ্যে ছিল।

সরকার কেন এই দমন নিপীড়নের পথে গেল? এটা পরিষ্কার যে, কর্তৃত্ববাদী বা প্রায় একনায়কতন্ত্রী সরকার শক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমে সরকারবিরোধী আন্দোলন দমনের চেষ্টা করে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতে কি সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন হয় না? সেখানে শক্তিপ্রয়োগের বদলে আলাপ-আলোচনা ও সমঝোতার পথকে প্রাধান্য দেয়া হয়।

আন্দোলনকারীদের আস্থা অর্জন করতে ন্যূনতম গণতান্ত্রিক চরিত্র থাকলে সরকার কী করতে পারত? পুলিশের গুলিতে রংপুরের আবু সাঈদের মৃত্যু এবং আন্দোলনের সমন্বয়কারীদের কয়েকজনকে ধরে নিয়ে যে অত্যাচার করা হয়েছিল তার তদন্ত করে বিচার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে দিত, আবাসিক হলগুলোয় প্রশাসনিকভাবে সিট বরাদ্দ করার ব্যবস্থা করা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দখলদারি বন্ধ করা ও ছাত্র সংসদ চালু করার উদ্যোগ নেয়া, আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে করা সব মামলা প্রত্যাহার, শিক্ষার্থীদের রাজনৈতিক, আইনি বা প্রশাসনিক হয়রানি না করার নিশ্চয়তাসহ আনুষঙ্গিক দাবিগুলো বাস্তবায়নের পথে হাটতো। কিন্তু সরকার গেল তার চিরচেনা রাস্তায়। যত সময় গড়াতে লাগল তত বেশি আক্রমনের মাত্রা বাড়িয়ে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার সর্বশেষ চেষ্টা করল। কিন্তু এতে কী শেষ রক্ষা হলো? হয়নি, বরং ছাত্র জনতার প্রতিরোধের আগুনে ভস্মীভূত হয়ে শেখ হাসিনা ও তার সরকারকে ক্ষমতা থেকে বিদায় নিতে হলো।

এটা তো সকলের কাছেই স্পষ্ট যে, শিক্ষার্থীদের মনে চাপা ক্ষোভ দিনের পর দিন পুঞ্জীভূত হয়েছিল অনেক কারণেই। বেকারত্ব, চাকরি পেতে নানা ধরনের দুর্নীতি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্ষমতাসীন দলের দমন পীড়ন, মূল্যস্ফীতি, দুর্নীতি, গরিবে-ধনীতে বৈষম্য, জীবনযাত্রার মান নিচে নেমে যাওয়া থেকে শুরু করে ভোট দিতে না পারা, পুলিশ ও প্রশাসনের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা ফলে ভোটের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন করতে না পারা, এধরনের সব ক্ষোভ পুঞ্জিভূত হয়ে বিক্ষোভে প্রকাশিত হয়েছে। ফলে এই আন্দোলনে সমর্থন ছিল সকল স্তরের মানুষের। অন্যায় দেখে মানুষ চুপ করে থাকে, দীর্ঘদিন সহ্য করে তার অর্থ এই নয় যে তারা সব কিছু মেনে নেন। শাসকেরা মানুষের এই মনোভাব বুঝতে চায় না তাই বিক্ষোভের প্রকাশ ঘটে সীমাহীনভাবে। এবারের ঘটনায় তার প্রমাণ পাওয়া গেলেও ভবিষ্যতের শাসকেরা শিক্ষা নেবে কী?

বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত কোটা সংস্কার নিয়ে কিন্তু সমাজের স্তরে স্তরে যে প্রকট বৈষম্য তার বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ এই আন্দোলনে ছাত্রদেরকে শক্তি যুগিয়েছে। বৈষম্যের কারণ শোষণ ও দুর্নীতি। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ফল হিসেবে সমাজে যে বেকারত্ব, দুর্নীতি, বৈষম্য তৈরি হয় তা আরও গভীর হয়েছে আওয়ামী লীগ সরকারের একতরফা নির্বাচন আর জবাবদিহি বিহীন সরকার পরিচালনা করার কারণে। ফলে মানুষ লড়েছে বারবার। এসব আন্দোলনে আপাত পরাজয়ের পরও মানুষ ঘুরে আরও শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলে। কোন আন্দোলন ব্যর্থ হয় না বরং পরবর্তী আন্দোলনের পটভূমি তৈরি করে। আন্দোলনের সামনে শেষ পর্যন্ত কোন ফ্যাসিস্ট শক্তিই দমন-পীড়ন চালিয়েও টিকে থাকতে পারে না। এবারের ছাত্র আন্দোলন সেই দৃষ্টান্তই দেখিয়ে গেল।

পাটকল রক্ষায় সম্মিলিত নাগরিক পরিষদের উদ্যোগে ২০ আগস্ট খুলনা শহরে সমাবেশ অনুষ্ঠিত

বন্ধ পাটকল সরকারি উদ্যোগে চালু, বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবি

◆ছাত্র-জনতা হত্যাকারী হাসিনা সরকারের বিচার কর
◆সন্ত্রাস দখলদারিত্বমুক্ত গণতান্ত্রিক ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠায় কার্যকর উদ্যোগ নাও
◆সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র সংসদ নির্বাচন দাও

উল্লিখিত তিন দফা দাবিতে ২০ আগস্ট সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ও বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে শাহবাগে ছাত্র-গণ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

আন্দোলনের দিনগুলি

আবু সাঈদের ভয়হীন মৃত্যু এবং আন্দোলনের দাবানল

শেষ পৃষ্ঠার পর

২ জুলাই, মঙ্গলবার
আন্দোলনকারীরা বেলা পৌনে তিনটার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে থেকে মিছিল করে নীলখেত, সায়েন্স ল্যাবরেটরি মোড় ঘুরে শাহবাগে গিয়ে অবরোধ কর্মসূচি পালন করেন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অবরোধ করেন ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক।

৩ জুলাই, বুধবার
ঢাকার শাহবাগে দেড় ঘণ্টা অবরোধ করে রাখেন। একই দাবিতে আরও ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ ও অবরোধ করেন।

৪ জুলাই, বৃহস্পতিবার
সরকারি চাকরিতে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধা কোটা বাতিলের পরিপত্র অবৈধ ঘোষণার বিষয়ে হাইকোর্টের রায় আপিল বিভাগে স্থগিত করেনি। প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের নেতৃত্বাধীন ছয় সদস্যের আপিল বিভাগ 'নট টুডে' বলে আদেশ দেন। এ দিন ছাত্র সমাবেশ থেকে ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়।

৫ জুলাই, শুক্রবার
ছুটির দিনেও বিক্ষোভ ও সড়ক অবরোধ করে।

৬ জুলাই, শনিবার
আন্দোলনকারীরা সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন, ছাত্র ধর্মঘট এবং সারা দেশে সড়ক-মহাসড়ক অবরোধের ডাক দেন। শিক্ষার্থীরা এই কর্মসূচির নাম দেয় 'বাংলা ব্লকেড'।

৭ জুলাই, রোববার
বাংলা ব্লকেডে স্থবির রাজধানী। অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা।

৮ জুলাই, সোমবার
ঢাকার ১১টি স্থানে অবরোধ, ৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ, ৩টি স্থানে রেলপথ এবং ৬টি মহাসড়ক অবরোধ। সব গ্রেডে অযৌক্তিক ও বৈষম্যমূলক কোটা বাতিল করে শুধু সংবিধান অনুযায়ী অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জন্য ন্যূনতম কোটা রেখে সংসদে আইন পাসের দাবি।

৯ জুলাই, মঙ্গলবার
অব্যাহত থাকে 'বাংলা ব্লকেড'।

১০ জুলাই, বুধবার
চার সপ্তাহের জন্য স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে নির্দেশ আপিল বিভাগের। শুনানি ৭ আগস্ট। আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা মনে করছেন, এটি সরকারের সিদ্ধান্তের বিষয়।

১১ জুলাই, বৃহস্পতিবার
আ. লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন, কোটাবিরোধী আন্দোলনকারীরা সর্বোচ্চ আদালতের বিরুদ্ধে শক্তি প্রদর্শন ও এটি অনভিপ্রেত ও সম্পূর্ণ বেআইনি। সংবাদ সম্মেলনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বলেন, শিক্ষার্থীরা 'লিমিট ক্রস' করে যাচ্ছেন।

১২ জুলাই, শুক্রবার
শুক্রবার ছুটির দিনেও দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ করেন শিক্ষার্থীরা।

১৩ জুলাই, শনিবার
সব গ্রেডে কোটার যৌক্তিক সংস্কারের দাবিতে রোববার গণপদযাত্রা করে রাষ্ট্রপতির কাছে স্মারকলিপি দেওয়ার কর্মসূচি ঘোষণা।

১৪ জুলাই, রোববার
গণভবনে সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বললেন, 'কোটা বিষয়ে আমার কিছু করার নেই।' 'মামলার পর আদালত যে রায় দেন, এতে নির্বাহী বিভাগের কিছু করার নেই। আদালতেই সমাধান করতে হবে।' তিনি আরও বলেন, 'মুক্তিযোদ্ধাদের নাতি-পুতিরা পাবে না, তাহলে কি রাজাকারের নাতি-পুতিরা চাকরি পাবে?' ২০১৮ সালের আন্দোলন প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী জানান, সে সময়ে তিনি বিরক্ত হয়ে কোটা বাতিল করে দিয়েছিলেন।

একই দিনে পদযাত্রা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে স্মারকলিপি দিয়ে আন্দোলনকারীরা কোটার যৌক্তিক সংস্কারের দাবিতে সরকারকে ২৪ ঘণ্টার সময় বেঁধে দেন। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে আন্দোলনকারীদের অবমাননা করা হয়েছে দাবি করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ করেন শিক্ষার্থীরা। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ শুরু করলে হামলা চালায় ছাত্রলীগ। মিছিল হয়েছে জাহাঙ্গীরনগর ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়েও।

১৫ জুলাই, সোমবার
আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন, আন্দোলন থেকে আত্মস্বীকৃত রাজাকার ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ মানসিকতা বা আচরণের প্রকাশ ঘটেছে। এর জবাব দেওয়ার জন্য ছাত্রলীগ প্রস্তুত।

বেলা তিনটায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দফায় দফায় ছাত্রলীগ ও আন্দোলনকারীদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। দেশের বিভিন্ন স্থানে হামলা হয়। আহত ২৯৭ জন ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসা নেন।

১৬ জুলাই, মঙ্গলবার
সারা দেশে নিহত হন ছয়জন। রংপুরে আন্দোলনকারী বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ পুলিশের বুলেটে নিহত হয়। ভিডিওতে দেখা যায় দুই হাত তুলে দাঁড়ানো স্থির আবু সাঈদকে খুব কাছ থেকে গুলি করে হত্যা করে পুলিশ। বিস্ফোরণমুখ পরিস্থিতি তৈরি হয় গোটা দেশে। নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে বুধবার গায়েবানা জানাজা ও কফিন মিছিল করবেন আন্দোলনকারীরা।

১৭ জুলাই, বুধবার
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের বিতাড়ন করে শিক্ষার্থীরা। ঢাকাসহ সারা দেশে ছাত্র বিক্ষোভ, সড়ক-মহাসড়ক অবরোধ, গায়েবানা জানাজা, কফিন মিছিল এবং দফায় দফায় সংঘর্ষ ও পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের হল বন্ধের ঘোষণা।

১৮ জুলাই, বৃহস্পতিবার
দেশব্যাপী প্রতিরোধ, সহিংসতা-সংঘর্ষ ও গুলিতে নিহত ২৭ জন। রাজধানী ছাড়াও দেশের ৪৭টি জেলায় দিনভর বিক্ষোভ, অবরোধ, পাল্টাপাল্টি ধাওয়া, পুলিশের হামলা-গুলি ও সংঘাতের ঘটনা ঘটে। সারা দেশে বিজিবি মোতায়েন।

১৯ জুলাই, শুক্রবার
কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের 'কমপ্লিট শাটডাউন' কর্মসূচি ঘিরে রাজধানী ঢাকায় ব্যাপক সংঘর্ষ-হামলা, ভাঙচুর, গুলি, অগ্নিসংযোগ ও প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। রাজধানী ঢাকা ছিল কার্যত অচল, পরিস্থিতি ছিল থমথমে। দেশের বিভিন্ন জেলাতেও ব্যাপক বিক্ষোভ, সংঘর্ষ ও সহিংসতা হয়। এদিন রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় গুলি ও সংঘর্ষে অন্তত ৪৪ জন নিহত। সারা দেশে নিহত ৫৬ জন।

আন্দোলনকারীরা জানান ৯ দফা দাবি না মানা পর্যন্ত চলবে 'শাটডাউন'। তাদের নয় দফা দাবি–

১. আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে অবৈধ উপায়ে ব্যবহার করে ছাত্র হত্যার দায় নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরকে মন্ত্রিপরিষদ ও দল থেকে পদত্যাগ করতে হবে।
২. ঢাকাসহ যত জায়গায় ছাত্র শহিদ হয়েছে সেখানকার ডিআইজি, পুলিশ কমিশনার ও পুলিশ সুপারদের চাকরি থেকে বরখাস্ত করতে হবে।
৩. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও প্রক্টরকে পদত্যাগ করতে হবে।
৪. যে সকল পুলিশ সদস্য শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য করে গুলি করেছে এবং ছাত্রলীগ, যুবলীগসহ যে সকল সন্ত্রাসীরা শিক্ষার্থীদের ওপর নৃশংস হামলা চালিয়েছে এবং পরিচালনার নির্দেশ দিয়েছে তাদেরকে আটক করে এবং হত্যা মামলা দায়ের করে দ্রুত সময়ের মধ্যে গ্রেপ্তার দেখাতে হবে।
৫. দেশব্যাপী যে সকল শিক্ষার্থী ও নাগরিক শহিদ ও আহত হয়েছেন তাদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে।
৬. ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগসহ দলীয় লেজুড়বৃত্তিক ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করে ছাত্র সংসদকে কার্যকর করতে হবে।
৭. অবিলম্বে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও হলসমূহ খুলে দিতে হবে।
৮. আর যে সকল ছাত্র কোটা সংস্কার আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন, তাঁদের কোনো ধরনের একাডেমিক ও প্রশাসনিক হয়রানি না করার নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে।
৯. প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ছাত্র হত্যার দায় নিয়ে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে।

সর্বাত্মক অবরোধের কর্মসূচিতে তিন দিনে নিহত ১০৩ জন। রাতে কারফিউ জারি, সেনাবাহিনী মোতায়েন। ইন্টারনেট সেবা বন্ধ।

২০ জুলাই, শনিবার
দেশজুড়ে কারফিউ ও সেনা মোতায়েন, সাধারণ ছুটি ঘোষণা। রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষ, ধাওয়া ও গুলি। সংঘর্ষে নিহত ২৬। সব মিলিয়ে চার দিনে নিহত ১৪৮।

২১ জুলাই, রোববার
সরকারি চাকরিতে কোটা পুনর্বহাল-সংক্রান্ত হাইকোর্টের রায় সামগ্রিকভাবে বাতিল (রদ ও রহিত) করে সর্বোচ্চ আদালতের রায় প্রদান। পাঁচ দিনে মৃত্যু ১৭৪। আন্দোলনের সমন্বয়ক নাহিদকে তুলে নিয়ে নির্যাতন।

২২ জুলাই, সোমবার
কোটাপ্রথা সংস্কার করে আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী তৈরি করা প্রজ্ঞাপন অনুমোদন দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। ছয় দিনে ১৮৭ জনের মৃত্যু।

২৩ জুলাই, মঙ্গলবার
কোটাপ্রথা সংস্কার করে প্রজ্ঞাপন জারি। ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় সংঘর্ষে ১৯৭ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।

২৪ জুলাই, বুধবার
এখন পর্যন্ত ২০১ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেল। নিখোঁজ থাকার পাঁচ দিন পর আসিফ ও বাকেরকে চোখ বাঁধা অবস্থায় ফেলে যাওয়া হয়েছে।

২৫ জুলাই, বৃহস্পতিবার
সব মিলিয়ে মৃত্যু ২০৪ জন। অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনা ছাড়াই কোটা সংস্কারের যে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে, সেটিকে আন্দোলনকারীরা চূড়ান্ত সমাধান মনে করছেন না। যথাযথ সংলাপের পরিবেশ তৈরি করে নীতিনির্ধারণী জায়গায় সব পক্ষের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে প্রজ্ঞাপন দিতে হবে। এ ছাড়া কোটা সংস্কারের বিষয়ে সংসদে আইন পাস করা হয়নি। তাই কোটা সমস্যার এখনো চূড়ান্ত সমাধান হয়নি।

২৬ জুলাই, শুক্রবার
এলাকা ভাগ করে চলছে 'ব্লক রেইড'। সারা দেশে অভিযান, ৫৫৫টি মামলা। এইদিন কারফিউ এর মধ্যে সকাল বেলা দেশব্যাপী ছাত্র-জনতা হত্যা ও গণগ্রেপ্তারের প্রতিবাদে গানের মিছিল করে প্রতিবাদী সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহ। বিকেলে শোক সমাবেশ ও কালো পতাকা মিছিল কর্মসূচি পালন করে বাম গণতান্ত্রিক জোট।

২৭ জুলাই, শনিবার
১১ দিনে গ্রেপ্তার ৯ হাজার ১২১ জন। এর মধ্যে ঢাকাই ২ হাজার ৫৩৬ জন। সমন্বয়কদের নিয়ে যাওয়া হয় ডিবি হেফাজতে।

২৮ জুলাই, রোববার
ডিবির হেফাজতে থাকা ছয়জন সমন্বয়ক এক ভিডিও বার্তায় সব কর্মসূচি প্রত্যাহারের কথা বলেছেন। ছয় সমন্বয়ক কর্মসূচি প্রত্যাহারের যে ঘোষণা দিয়েছেন, তা আন্দোলনকারীদের প্রকৃত অবস্থান নয় বলে জানিয়েছেন তিনজন সমন্বয়ক। তাঁরা বলেছেন, গোয়েন্দা পুলিশের কার্যালয়ে তাদের জিম্মি করে লিখিত বক্তব্য পাঠ করানো হয়েছে।

২৯ জুলাই, সোমবার
৬ সমন্বয়ক ডিবি হেফাজতে। 'জাতিকে নিয়ে মশকরা কইরেন না' এক শুনানিতে এ মন্তব্য করেছেন হাইকোর্ট। ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে শিক্ষার্থীদের ওপর ছাত্রলীগের হামলা এবং পুলিশ লাঠিপেটা করেছে। জাহাঙ্গীরনগর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের কর্মসূচিতে শিক্ষকও যোগ দেন। নিহত বেড়ে ২১১ জন। সরকার ঘোষিত রাষ্ট্রীয় শোক প্রত্যাখ্যান আন্দোলনকারীদের। এর বদলে লাল কাপড় মুখে ও চোখে বেঁধে ছবি তোলা এবং অনলাইনে প্রচার কর্মসূচির ঘোষণা।

৩০ জুলাই, মঙ্গলবার
হত্যার বিচার চেয়ে মুখে লাল কাপড় বেঁধে মিছিল। জাতিসংঘ মহাসচিবের বিবৃতি, স্বচ্ছ তদন্তের আহ্বান। কোটা সংস্কার আন্দোলন ঘিরে সংঘর্ষে নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকের প্রোফাইল লাল রঙের ফ্রেমে রাঙিয়েছেন অনেকে। 'মার্চ ফর জাস্টিস' কর্মসূচি পালন করার ঘোষণা।

৩১ জুলাই, বুধবার
মার্চ ফর জাস্টিস কর্মসূচির পর বৃহস্পতিবারের জন্য কর্মসূচি ঘোষণা করেছে কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনকারীদের একাংশ। এই দিনের কর্মসূচির নাম দেওয়া হয়েছে 'রিমেম্বারিং আওয়ার হিরোস'।

৩২ জুলাই, বৃহস্পতিবার
গোয়েন্দা পুলিশের হেফাজতে থাকা আন্দোলনের ছয় সমন্বয়ককে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

৩৩ জুলাই, শুক্রবার
ছাত্র-জনতার আন্দোলনে গণমানুষের অংশগ্রহণ। অন্তত ২৮ জেলায় কর্মসূচি পালন। পুলিশ, ছাত্রলীগ-যুবলীগের হামলা। সংঘর্ষে নিহত ২।

৩৪ জুলাই, শনিবার
ঢাকাসহ অন্তত ৩৩টি জেলা বিক্ষোভ। কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার পরিণত হয় জনসমুদ্রে। 'মানুষের জীবনের নিরাপত্তা ও সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সরকারের পতন ও ফ্যাসিবাদের বিলোপ'-এর এক দফা দাবি 'সর্বাত্মক অসহযোগ'-এর ঘোষণা।

৩৫ জুলাই, রবিবার
সরকারের পদত্যাগের এক দফা দাবিতে আন্দোলনের ডাকা সর্বাত্মক অসহযোগ কর্মসূচি ঘিরে রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে ব্যাপক সংঘর্ষ ও হানাহানির ঘটনা ঘটছে। সরকার দলের নেতা-কর্মী, সমর্থক ও পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষে রাজধানী ঢাকাসহ ২০টি জেলা-মহানগরে ৯৮ জন নিহত হয়েছেন, আহতের হয়েছে অসংখ্য। গতকাল দেশের অন্তত ৫০টি জেলায় সংঘাত-সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। বেশির ভাগ জায়গায় বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে মূলত সংঘর্ষে জড়ান ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও দলটির সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। লাঠিসোঁটা ও দেশি অস্ত্রের পাশাপাশি পিস্তল, শটগান, বন্দুক, কাটা রাইফেলের মতো আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে আক্রমণ। প্রতিরোধ করতে আরও শক্তি দেখানোর ঘোষণা দেয় আওয়ামী লীগ। শিক্ষার্থীদের 'মার্চ ফর ঢাকা' কর্মসূচি ঘোষণা।

৩৬ জুলাই, (৫ আগস্ট) সোমবার
ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের বিজয়, শেখ হাসিনার পদত্যাগ। বোন শেখ রেহানাকে নিয়ে দেশ ছেড়ে ভারতে পলায়ন। জনগণের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দিলেন সেনা প্রধান ওয়াকার-উজ-জামান। সাধারণ জনতার দখলে প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন গণভবন। জাতীয় সংসদ ভেঙে দিয়ে অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠনের ঘোষণা। এদিন একদিনেই নিহত ১০৮ জন। [হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস) পর্যবেক্ষণে মৃত্যুর সংখ্যা ৮১৯ জন।]

আন্দোলনের দিনগুলি

ছাত্র-জনতার খুনি হাসিনা সরকারের অবিলম্বে পদত্যাগের দাবি প্রেসক্লাবের সামনে শহিদদের প্রতি অস্থায়ী শহিদ বেদিতে শ্রদ্ধা নিবেদন

ছাত্র-জনতা হত্যার বিচার, কারফিউ প্রত্যাহার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়া, ছাত্র হত্যার দায়ে শেখ হাসিনার পদত্যাগসহ শিক্ষার্থীদের দাবির প্রতি সংহতি জানিয়ে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন এবং সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের যৌথ উদ্যোগে ৩ আগস্ট '২৪ জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সংহতি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মুক্তা বাড়ৈ-র সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক রায়হান উদ্দীনের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি মাহির শাহরিয়ার রেজা। এছাড়াও সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন ডাকসুর সাবেক সাধারণ সম্পাদক ডা. মুশতাক হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক জোবাইদা নাসরিন, বাংলাদেশ যুব ইউনিয়নের সভাপতি খান আসাদুজ্জামান মাসুম, প্রকৌশলী রাশেদুল হাসান রিপন, সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের সাংগঠনিক সম্পাদক ডা. মনীষা চক্রবর্তী, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবিব বুলবুল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এনামুল হাসান অনয় এবং সুহাইল আহমেদ শুভ।

সংহতি সমাবেশের শুরুতে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে নির্মিত অস্থায়ী শহিদ বেদিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্র ফ্রন্ট, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি), বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ, যুব ইউনিয়ন, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র, সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ। উল্লেখ্য, শ্রমজীবী মানুষ শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে সংহতি জানান।

সমাবেশে ডা. মুশতাক হোসেন বলেন, '৬৯-এ আইয়ুব খানের যে পরিণতি হয়েছিল হাসিনারও একই পরিণতি হতে যাচ্ছে। লাঠি-গুলি মেরে গণ আন্দোলন বন্ধ করা যাবে না। লাশের উপর দিয়ে সংলাপ হয় না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক জোবাইদা নাসরিন কণা বলেন, আমাদের শিক্ষার্থীদের উপর নির্বিচারে গুলি চালানো হয়েছে। স্মরণকালের ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে সরকার ক্ষমতায় থাকতে পারে না। তাকে অবিলম্বে পদত্যাগ করতে হবে।

সভায় নেতবৃন্দ আরও বলেন, শান্তিপূর্ণ আন্দোলন এখন স্বৈরাচার পতনের এক দফা আন্দোলনে রূপ নিয়েছে। বুকে গুলি করেও যখন আমাদের দমানো যায়নি তখন আর কোনো কিছুতেই আমাদের দমানো যাবে না। মানুষের দীর্ঘ দিনের বঞ্চনা দ্রোহে পরিণত হয়েছে। স্বৈরাচারের পতন নিশ্চিত করেই আমরা ঘরে ফিরবো।

নেতৃবৃন্দ বলেন, আন্দোলনে আমাদের সমর্থন ছিল, আছে এবং থাকবে। বিজয় না আসা পর্যন্ত আমরা কেউ ঘরে ফিরে যাব না। আগামীকাল থেকে শুরু হওয়া অসহযোগ আন্দোলন সফল করতে দেশবাসীকে আহ্বান জানাই। স্বৈরাচারের পতনের মধ্যে দিয়েই আমরা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করবো।

ছাত্র হত্যার বিচার দাবিতে

প্রতিবাদী সংগঠনসমূহের গানের মিছিল

ছাত্র-জনতাকে হত্যা, নির্যাতন-গণগ্রেপ্তার, হামলা-মামলার বিচার দাবিতে রাজধানীতে গানের মিছিল করেছে প্রতিবাদী সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহ। ৩০ জুলাই প্রতিবাদী সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহের উদ্যোগে এ গানের মিছিল নূর হোসেন চত্বর থেকে শুরু হয়। বাহাদুর শাহ পার্কে গিয়ে মিছিল শেষ হওয়ার কথা থাকলেও বাধার কারণে মিছিল নিয়ে জিপিও চত্বর থেকে একটু সামনে এগোনোর পর বাধা দেয় পুলিশ। পরে, রাস্তাতেই বসে পড়ে গান, আবৃত্তি, স্লোগানে মুখরিত করেন বিভিন্ন সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

সেখানে শুরু হয় প্রতিবাদ সমাবেশ। সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, শিক্ষার্থীদের আন্দোলন ছিল শান্তিপূর্ণ। সরকার তা দমনে গুলিবর্ষণ, হত্যা অপরিসীম বলপ্রয়োগ করে চলছে। এ আন্দোলনে হত্যাকাণ্ডের পরিণতি হবে ভয়াবহ। প্রাণহানির ঘটনার সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হবে। এসব হত্যাকাণ্ডের দায় নিয়ে সরকারকে পদত্যাগ করার আহ্বানও জানান তারা। আন্দোলন কোটা সংস্কার দিয়ে শুরু হলেও এখন সরকার পতনের এক দফায় এসে দাঁড়িয়েছে।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় বরিশাল, খুলনায় সংখ্যালঘু এলাকা ও উপাসনালয় পরিদর্শন ও সংহতি সমাবেশ

৮ আগস্ট বরিশালে 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা কমিটি'র উদ্যোগে শহরের ফলপট্টি, কাঠপট্টি, কালীবাড়ি রোড, নতুনবাজারসহ বিভিন্ন সংখ্যালঘু এলাকা ও ধর্মীয় উপাসনালয় পরিদর্শন করা হয়।

নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন এলাকার সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধভাবে যে কোনো অপতৎপরতার মোকবিলা করার আহবান জানান এবং যেকোন সহিংসতার ঘটনায় সম্প্রীতি রক্ষা কমিটির নেতৃবৃন্দকে জানালে তাদের পাশে দাঁড়াবার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

খুলনায় 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় সমাবেশ'।।

রংপুর, দিনাজপুর, নারায়ণগঞ্জসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় সমাবেশ-মিছিল, মানববন্দন কর্মসূচি পালিত হয়।

জীবন, রক্ত আর চোখের জলে বৈষম্য অবসানের স্বপ্ন

শেষ পৃষ্ঠার পর

প্রধানমন্ত্রীত্ব থেকে পদত্যাগ এবং দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন ৫ আগস্ট। ক্ষমতায় টিকে থাকতে ৫ আগস্ট এবং তার পরদিন পর্যন্ত দেশে যত হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয়েছে, তা স্বাধীনতার পর ৫ দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ। সব মিলিয়ে কোটা সংস্কার আন্দোলন, পরবর্তী বিক্ষোভ ও সরকারের পতনের পর সহিংসতায় এখন (১৯ আগস্ট) পর্যন্ত অন্তত ৬২৬ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়। প্রতিদিনই মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে আহদের মধ্য থেকে। বিভিন্ন সূত্র মতে এ সংখ্যা এক হাজারের বেশি। মৃত্যুর তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, ৪ থেকে ৬ আগস্ট সময়ে নিহতদের মধ্যে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগসহ দলটির নেতা, কর্মী ও সমর্থক রয়েছেন অন্তত ৮৭ জন। পুলিশ সদস্য রয়েছেন ৩৬ জন। বিজিবি, র‍্যাব ও আনসার সদস্য রয়েছেন একজন করে। আন্দোলনে পুলিশ সদস্যদের মৃত্যু এই ভূখণ্ডে এক নজিরবিহীন ঘটনা। ১৬ জুলাই থেকে ৬ আগস্ট পর্যন্ত মোট ৪২ জন পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন পুলিশের মহাপরিদর্শক। এই ৪২ জনের মধ্যে দুজন পুলিশ সদস্য র‍্যাবে নিয়োজিত ছিলেন।

৪ থেকে ৬ আগস্ট সময়ে নিহতদের মধ্যে অন্তত ২৩ জন শিক্ষার্থী। তাঁরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে পড়তেন। এ সময়ে নিহতদের মধ্যে বিএনপি ও দলটির অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের ১২ জন নেতা, কর্মী ও সমর্থক রয়েছেন। ৩২৬ জনের মধ্যে বাকি ১৬৮ জনের সরাসরি রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা নেই অথবা জানা যায়নি। আর ৪২ জনের পরিচয়ই এখনো নিশ্চিত হওয়া সম্ভব হয়নি। পুলিশের গুলি ও সংঘর্ষে আহত হয়েছেন হাজার হাজার মানুষ।

আওয়ামী লীগ ক্ষমতা হারালে কিংবা শেখ হাসিনার পদত্যাগের পর প্রতিশোধের পালা শুরু হবে এটা জানত সবাই। আওয়ামী লীগের নেতাদের কেউ কেউ বলেছেনও এ কথা। কিন্তু ক্ষমতায় থেকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করেননি বরং নিপীড়ন চালিয়েছেন আরও বেশি। প্রদীপ নেভার আগে জ্বলে ওঠার মতো ক্ষমতার শেষ কয়েক দিন তাদের কথা এবং কাজ ছিল চরম ফ্যাসিস্টদের মতো। আন্দোলনকারী এবং প্রতিপক্ষকে নিশ্চিহ্ন করার হিংস্রতা নিয়ে নিজেরা নেমেছিল, পুলিশকে নামিয়েছিল। ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়নি, ভেবেছিল নিরাপদ সড়ক আন্দোলন ও পূর্বের দফার কোটা সংস্কার আন্দোলনকে যেভাবে দমন করেছিল এবারও তারা সফল হবে। কিন্তু ক্ষমতার দম্ভে তারা ইতিহাস থেকে শিক্ষা না নিলেও আন্দোলনকারীরা পরাজয় থেকে শিক্ষা নিয়েছিল। মৃত্যুকে জয় করার সাহস অর্জন করেছিল। ক্ষমতাসীনদের ক্ষমতা ছিল মিথ্যার এবং অপপ্রচারের। ক্ষমতা প্রয়োগ করেছে পুলিশ আর প্রশাসন দিয়ে, মেরে এবং মামলায় জড়িয়ে জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল বিরোধীদের। শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছে আদালতকে। ক্ষমতাসীনরা দুর্নীতি করতে গিয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত করেছে প্রশাসন, পুলিশ এমনকি বিচার বিভাগকেও। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও দলীয়করণ ও দুর্নীতিগ্রস্ত করে ফেলায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি নষ্ট করেছে। দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারি আমলাদের সম্পদের পাহাড় দেখে বিস্মিত হয়েছে দেশবাসী। জবাবদিহি ছিল না ব্যবসাবাণিজ্য কোনোখানেই। সিন্ডিকেট গড়ে তুলে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় যে লুণ্ঠন ও সম্পদ পাচার হয়েছে তা অকল্পনীয়। দ্রব্যমূল্যের কষাঘাতে জনজীবন বিপর্যস্ত আর চাঁদাবাজিতে ছিল অতিষ্ঠ। আকস্মিক সম্পদের মালিক হয়েছে অনেকেই, যাদের পরিচয় তারা ক্ষমতাসীন দলের অনুগ্রহপুষ্ট। এসব দেখে মানুষের ক্ষোভ ক্রমাগত বেড়েছে।

ক্ষুব্ধ জনতা হামলা করেছে থানায় জ্বালিয়ে দিয়েছে অনেক স্থাপনা

দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের প্রকাশ ঘটিয়েছে মানুষ। হামলা করে থানা আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে। গুলি করেছিল পুলিশ, ব্যবহার করেছিল সব ধরনের অস্ত্র। কিন্তু আন্দোলনকারীরা বলেছিল, গুলি শেষ হয়ে যাবে কিন্তু আমরা শেষ হবো না। পরাজিত হয়েছে পুলিশ। ছাত্র-জনতার রোষানলে পড়ে নিহত হয়েছেন কিছু পুলিশ সদস্যও। গুলিতে মরেছে ছাত্র-জনতা। ক্ষুব্ধ জনতা পিটিয়ে মেরেছে পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের। প্রতিশোধের আগুনে পুড়েছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের মন্ত্রী-নেতা, কর্মীদের অনেকেরই বাড়িঘর, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান। আগুনে পুড়েছে তাদের প্রতিষ্ঠান, পুড়ে মৃত্যুবরণ করেছে অনেকে। গুলি চালিয়েও মানুষকে ঠেকাতে পারেনি। পুঞ্জীভূত ক্রোধের ক্ষমতা এতই প্রচণ্ড। এত দিনের দম্ভ, অহংকার, মানুষকে অপমান করার পরিণতিতে বাঁচার আকুতি নিয়ে মরতে হয়েছে বা বাঁচতে গিয়ে পালাতে হয়েছে তাদের। ইতিমধ্যে ধ্বংস করা, গুঁড়িয়ে দেওয়া এবং পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে অনেক সরকারি স্থাপনা। বিক্ষুব্ধদের নিয়ন্ত্রণ করার কেউ ছিল না, কেউ নিয়ন্ত্রণ করতেও যায়নি। ক্রোধে যেন উন্মত্ত হয়ে গিয়েছিল একদল মানুষ। সে সময় যুক্তির কথা, মানবিকতা সব যেন পরাস্ত হয়ে গিয়েছিল। পনেরো বছরের দুর্নীতি, দুঃশাসন আর দমনপীড়নের জ্বালায় মানুষ যেন অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ভুলেই গিয়েছিল যে, এসব জনগণের সম্পত্তি। কারণ ক্ষমতাসীনরা এসব প্রতিষ্ঠানের গণতান্ত্রিক চরিত্র ধ্বংস করে দিয়েছিল। এই অভ্যুত্থানে উদঘাটিত হয়েছে অনেক দিনের ধারণা করা আয়না ঘরের অস্তিত্ব। প্রচারিত ছিল যে, গুম করে রাখা মানুষদের বছরের পর বছর আটকে রেখে নির্যাতন করা হচ্ছে প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা পরিদপ্তরের (ডিজিএফআই) ‘আয়না ঘর’ নামে পরিচিত নির্যাতন কেন্দ্রে। সরকারের পক্ষ থেকে ক্রমাগত অস্বীকার করা হয়েছে। কাউকে গুম করা হয়নি, এ কথা জোরের সঙ্গে বলা হয়েছে। কিন্তু ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ হওয়ার পরপরই আয়না ঘর থেকে বন্দিদের মুক্তি যেমন বিস্ময় জাগায় তেমনি প্রশ্ন তৈরি করে, এভাবে একটি বাহিনীর নামে নির্যাতন করা কি অপরাধ নয়? এটা কোন আইনে করা হয়েছে?

প্রশ্ন জাগে কেন এমন হলো?

২০০৮ সালে তো আপেক্ষিক অর্থে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়ে শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এসেছিলেন। মানুষ ভোট দিল কী না দিল, কোনো পরোয়াই তিনি করেননি। পুলিশ, প্রশাসন ব্যবহার করে তিনি ক্ষমতাকে এতটাই সংহত করেছিলেন যে, কোনো প্রতিবাদ বা বিরোধিতা করে লাভ হয়নি। নিজেকে অসীম ক্ষমতাধর এবং প্রতিপক্ষকে তুচ্ছ ভাবার যে মানসিকতা তিনি তৈরি করেছিলেন, তা দলের ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত সংক্রমিত হয়েছিল। ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ এবং আমৃত্যু ক্ষমতায় থাকার একটা গোপন বাসনা চরিতার্থ করতে সমালোচনার কণ্ঠকে চেপে ধরতে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা বিশেষ করে অনলাইন নিয়ন্ত্রণ করতে সরকার ‘সাইবার নিরাপত্তা আইন’ প্রয়োগ করেছে। নাগরিক অধিকারগুলো কেড়ে নেওয়া হয়েছে মারাত্মকভাবে। নাগরিক সমাজ অপমানিত হয়েছে পদে পদে। জনগণ একদিকে উন্নয়নের গল্প শুনাচ্ছে আর অন্যদিকে গরিব ও ধনীর বৈষম্য বেড়েছে। ব্যাংক কেলেঙ্কারি বেড়েছে। ঋণখেলাপিদের তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়েছে। প্রচণ্ড অর্থনৈতিক বৈষম্যের সঙ্গে ব্যাপক দুর্নীতি মিলিত হয়ে জনগণের অসন্তোষকে ভীষণভাবে বাড়িয়ে তুলেছে।

সাম্প্রতিক যে ছাত্র আন্দোলন শেষ পর্যন্ত হাসিনাকে পদত্যাগে বাধ্য করল, তার শুরুটা হয়েছিল সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের একটি সাধারণ দাবি থেকে। স্ফুলিঙ্গও যে দাবানল তৈরি করে তার একটি হুঁশিয়ারিমূলক দৃষ্টান্ত এটা। এই ভূখণ্ডে গণ-অভ্যুত্থানে সরকার পতন হয়েছে কয়েকবার কিন্তু পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা এই প্রথম। শেখ হাসিনার পদত্যাগ ও দেশত্যাগ শুধু বাংলাদেশ নয়, সারা বিশ্বের জন্য এক পরিষ্কার বার্তা দিয়েছে যে উন্নয়নের নামে বৈষম্য, দুর্নীতি, দমনপীড়ন আর অপমান মানুষকে কতটা ক্ষুব্ধ করে তোলে।

থানা এবং পুলিশ কেন আক্রান্ত হলো?

একটি বিষয় উল্লেখ করার মতো। এই ভূখণ্ডের ইতিহাসে এত বেশি পুলিশের ওপর আক্রমণ আগে কখনো হয়নি। ব্রিটিশ আমলে অত্যাচারী পুলিশকে গুপ্ত হত্যা করা হয়েছে সেটা হাতে গোনা কয়েকজন এবং তারা সবাই ছিলেন পুলিশের বড় কর্তা। কিন্তু এবার থানা পুড়িয়েছে এমন কি পুলিশের সদর দপ্তরেও হামলা হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, পুলিশ কেন তাদের সদর দপ্তরকে রক্ষা করতে পারেনি? আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা যেভাবে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছে, পুলিশের একটা বড় অংশ কি একই কারণে একই পথ অনুসরণ করে পালিয়ে গিয়েছিল? কিন্তু পুলিশ তো প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী। তারা কেন দলীয় কর্মচারী হয়ে গেল?

গত ১৫ বছরের দুটি বড় বিষয় এখানে স্মরণ করা প্রয়োজন। একটি হচ্ছে দলীয় রাজনৈতিক আনুগত্যই ছিল নিয়োগ ও পদোন্নতির প্রধান শর্ত; আর অন্যটি হচ্ছে দুর্নীতির বিনিময়ে চাকরি দেওয়া। দ্বিতীয় শর্ত প্রথম শর্তকে ছাপিয়ে গিয়েছিল। টাকার বিনিময়ে চাকরি পাওয়ায় দুর্নীতি লাগামছাড়া হয়ে পড়েছিল। গ্রেপ্তার বাণিজ্য, মানুষকে জিম্মি করে টাকা আদায়, রিমান্ডে নেওয়ার নামে টাকা আদায়, অপরাধীদের সঙ্গে সমঝোতা এমনকি মাদক ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যোগসাজশ করে টাকা রোজগার করার কথা তো ছিল ওপেন সিক্রেট। আর দলীয় আনুগত্যের কারণেই সরকারবিরোধীদের দমনে পুলিশ বেপরোয়া আচরণ করেছে। আন্দোলন দমন করতে পুলিশ যতই নিষ্ঠুর হয়েছে, ততই তাদের প্রতি বিক্ষোভকারীদের আক্রোশ এবং প্রতিশোধ নেওয়ার প্রবণতা বেড়েছে। ফলে এই বিপর্যয়ের জন্য পুলিশ বাহিনীর পরিচালনাকারীরাই দায়ী। রাজনৈতিক দল এবং পুলিশের বড় কর্তারা পুলিশ বাহিনীকে ক্ষমতাসীন দলের নির্যাতক বাহিনীতে পরিণত করেছিলেন। যার বিষময় ফল ভোগ করতে হয়েছে সবাইকে।

প্রতিশোধ তো সমাধান নয়

আওয়ামী লীগের অনেক নেতাকর্মী এখন ভীষণরকম প্রতিশোধমূলক আক্রোশের শিকার হচ্ছেন, অনেক ক্ষেত্রেই চরম নিষ্ঠুরতার বহিঃপ্রকাশ ঘটছে। ক্ষমতায় থাকার সময়ে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা বিরোধী দলের কর্মী-সমর্থকদের যে নিগৃহীত করেছেন তাও যেমন নিন্দনীয়, তেমনি নিন্দনীয় প্রতিশোধের নামে হত্যা ও লুটপাট। সাম্প্রদায়িক হামলার সঙ্গে জড়িতদের শাস্তির আওতায় আনতে হবে। এখন তাহলে কী করণীয়? শুধু অন্তর্বর্তী সরকারের ভূমিকা যেন মানুষের মনে আস্থা ও বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে পারে সেই লক্ষ্যে প্রশাসন, পুলিশ, বিচারবিভাগ সর্বত্র জবাবদিহির আইনি কাঠামো গড়ে তুলতে হবে। স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতা কাঠামো সংস্কারের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে। প্রশাসন, পুলিশ ও বিচার বিভাগকে সম্পূর্ণ দলীয় আনুগত্যমুক্ত করা, কোনো এক দলের আনুগত্য থেকে অন্য আরেক দলের আনুগত্য নয়। গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলোর তদন্তের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া এবং অর্থনৈতিক অপরাধ ও দুর্নীতির অভিযোগগুলোর বিচারের প্রশ্নগুলোও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। নির্বাচন পদ্ধতির সংস্কার করা এবং সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য নির্বাচন ব্যবস্থার যে আকাঙ্ক্ষা তা পূরণে পদক্ষেপ নিতে হবে।

ইতিহাস বলে, যেকোনো গণ অভ্যুত্থানে এ ধরনের উন্মত্ততা, প্রতিশোধ পরায়ণতার প্রকাশ ঘটে থাকে। কিন্তু প্রতিশোধ কোনো সমাধান নয়, এই দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবস্থার বদল করতে হবে। দরকার রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সংস্কৃতিতে বদল। দখলদারিত্ব, চেহারার পরিবর্তন হলো, কিন্তু চরিত্রের যদি বদল না হয় তাহলে এত রক্তদান বৃথা হয়ে যাবে। অর্থনৈতিক বৈষম্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটে শিক্ষা, চিকিৎসা, কর্মসংস্থান, নারী, ধর্ম ও জীবনযাত্রার সর্বক্ষেত্রে। শ্রমিক-কৃষক, ছাত্র-আদিবাসী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা হয় বৈষম্যের নির্মম শিকার। সংস্কারের আকুতি যেন সুবিধার প্রলোভনে পরাস্ত না হয়, এটাই সাধারণ মানুষের অতি ন্যূনতম চাওয়া। এই চাওয়াকে বাস্তবায়ন করতে হলে সংস্কার প্রয়োজন।

অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়েছে কী করবেন তারা?

ছাত্র-শ্রমিক জনতার গণ অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনার পদত্যাগ ও দেশ ত্যাগের পরিস্থিতিতে ৮ আগস্ট রাত ৯টা ১৫ মিনিটে ড. মোহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বতীকালীন সরকার শপথ নিয়েছে। এই সরকারের সামনে রয়েছে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জগুলো উপেক্ষা করা বা এড়িয়ে যাওয়ার কোন উপায় নেই। চ্যালেঞ্জগুলোর কিছু এখনই, কিছু স্বল্প মেয়াদে এবং কিছু দীর্ঘমেয়াদে মোকাবিলা করতে হবে। দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ এবং জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করতে হলে এসব কাজ করা সময়ের দাবি।

গত পনের বছরে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দেশের পুলিশ ও প্রশাসনের শৃঙ্খলা। এই প্রতিষ্ঠানগুলো যে রাষ্ট্রীয় এবং এখানে কর্মরতরা যে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী তা ভুলিয়ে দিয়ে দলীয় কর্মীর মতো ভূমিকা আর দুর্নীতির অবাধ সুযোগের কারণে এই প্রতিষ্ঠানগুলো দমন পীড়নের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছিল। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এই দুই প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষক সমাজের একটা বড় অংশকে এতটা অনৈতিক কাজে যুক্ত করা হয়েছিল যার অতীত নজির নেই। প্রশাসনিক দায়িত্ব, সরকারের নির্দেশ মানতে গিয়ে মানবিক মূল্যবোধের ও নৈতিকতার যে অধঃপতন ঘটেছে সেখান থেকে উত্তরণের উপায় বের করতে হবে।

একথা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতেই হবে যে, যদি স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ক্ষমতার পালাবদল না হয় তাহলে সংঘাত অনিবার্য। এই সংঘাত রাজনৈতিক রূপ নেবেই। যদি গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে সরকারের পতন হয়, তাহলে যে সাময়িক শাসনতান্ত্রিক শূন্যতা তৈরি হয় সেই সময় এক ধরনের অরাজকতা চলে। আর এই সময়ে তাৎক্ষণিক সুবিধা নেয়া, শত্রুতা, প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা, জমি-বাড়ি, সম্পদ দখল করার মতো ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটে। এসব যারা করে সেই মানুষগুলোর কোনো সামাজিক দায় নেই, থাকে না কোন লজ্জা বা কোনো মানবিকবোধ। কাজেই সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা বিধান করা, দখলবাজী বন্ধ করা, দেশকে আইনশৃঙ্খলার আওতায় নিয়ে আসার কাজটি প্রথম এবং প্রধান। দ্বিতীয় কাজটি হলো দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধ করতে বাজারে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা। সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে অনিয়ন্ত্রিত বাজারের কারণে। চাহিদা-সরবরাহের সাধারণ নীতিকে পর্যুদস্ত করে বাজার সিন্ডিকেট সরবরাহ চেইনে কৃত্রিম সংকট তৈরি করে সাধারণ মানুষের জীবনকে অসহনীয় করে তুলেছে। ফলে বাজার সিন্ডিকেট ভেঙে দেয়া এবং দ্রব্যমূল্য সহনীয় করে সাধারণ মানুষের জীবনে স্বস্তি আনা অন্যতম চ্যালেঞ্জ। আর একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। গণতন্ত্রের চর্চা এবং জবাবদিহিতা না থাকায় গত পনেরো বছর রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো এমন দলীয়ভাবে কুক্ষিগত

এরপর পৃষ্ঠা ১২ কলাম ১

MONTHLY VANGUARD
ভ্যানগার্ড

- বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর মুখপত্র
- আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০২৪
- ২৩/২ তোপখানা রোড (তৃতীয় তলা), ঢাকা-১০০০। ফোন : ০২ ৪১০৫৩৬৪৪
- Website : www.spb.org.bd

জীবন, রক্ত আর চোখের জলে
বৈষম্য অবসানের স্বপ্ন

প্রিয়জন হারানোর বেদনা, পঙ্গু হয়ে যাওয়া কর্মক্ষম শ্রমজীবী মানুষ আর চোখ হারানো শিক্ষার্থীসহ লাখো ছাত্র-শ্রমিক, জনতার সংগ্রামের ফলাফল হিসেবে শেখ হাসিনা পদত্যাগ ও দেশত্যাগ করেছে। সংগ্রাম সফল হয়েছে। কিন্তু এই সাফল্যের পরও একটা আশঙ্কা উঁকি দেয়। কারণ বৈষম্যের অবসান ও সংস্কারের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে দেশের মানুষ লড়ছে বহু দিন ধরে। এই লড়াইয়ে রক্ত দিয়ে, জীবন দিয়ে প্রাথমিক বিজয় অর্জন করেছে অনেকবার। কিন্তু বিজয় হাতছাড়া হয়েছে বারবার। তারপরও বঞ্চনা আর অপমানের প্রতিকার চেয়ে মানুষ লড়ে যায় বারবার। প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের মাধ্যমে রচনা করেছে '৫২, '৬২, '৬৯, '৯০ আন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থান। কিছুটা পার্থক্য সত্ত্বেও এবারের ছাত্র গণঅভ্যুত্থান অতীতের সেই স্মৃতিকে মনে করিয়ে দিয়েছে আবার। সাধারণভাবে দেখলে এটা স্পষ্ট যে, পনেরো বছরের স্বৈরশাসকের উচ্ছেদ হয়েছে, ছাত্র-শ্রমিক, জনতার অভ্যুত্থানে। বিজয়ের উল্লাসে ফেটে পড়েছে সারা দেশ। লাখো মানুষ রাস্তায় নেমে এসেছে। মানুষ গান গেয়েছে, নেচেছে, ভুলে গিয়েছে এতদিনের বেদনা, কষ্ট আর অপমান। সব ছাপিয়ে সবার কণ্ঠে একই কথা অনেক বেদনা সয়ে এবার মনে হয় গণতন্ত্র পাবো।

ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ আর প্রতিশোধের আগুন

অত্যাচার, অহমিকা আর অপমান মানুষকে কতখানি ক্ষুব্ধ করে আর রাজনীতি মানুষের জীবনকে কতভাবে প্রভাবিত করে তা বাংলাদেশের মানুষ আবার দেখলো। কট্টর রাজনীতি বিমুখ মানুষও রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখতে পারে নাই। কারণ এ দেশ আন্দোলন সংগ্রামের দেশ। এদেশের মতো এত রাজনৈতিক আলোচনায় আগ্রহী মানুষ পৃথিবীতে খুব কম দেশেই আছে। কিন্তু জুলাই থেকে আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে যে রাজনৈতিক আন্দোলনের ঝড় বয়ে গেল তা বাংলাদেশে তো বটেই এই উপমহাদেশের মানুষ কখনো দেখেনি। ছাত্র গণঅভ্যুত্থানের এ এক নতুন নজির স্থাপন করেছে বাংলাদেশের ছাত্র জনতা। মৃত্যু-রক্ত, আর কান্না মিশিয়ে এত সাহস আর দ্রোহ দেখেনি মানুষ আগে। গণ আন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনা

এরপর পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ১

আবু সাঈদের ভয়হীন মৃত্যু এবং আন্দোলনের দাবানল

১৬ জুলাই রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বেরোবি) শিক্ষার্থী ও বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক আবু সাঈদকে পুলিশ গুলি করে হত্যা করে। এই মৃত্যু সারাদেশে আন্দোলনের স্ফুলিঙ্গকে দাবানলে পরিণত করে। বিক্ষোভ-সংঘাত সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। সর্বস্তরের মানুষ আন্দোলনে যুক্ত হয়।

স্বৈরাচার হাসিনা সরকার পতনের সময়কাল

কোটা সংস্কারের দাবিতে এই দফা আন্দোলন শুরু হয় ১ জুলাই। ১ জুলাই থেকে সে আন্দোলন ক্রমাগত বিস্তৃত হতে থাকে এবং এক পর্যায়ে সরকার পতনের এক দফা আন্দোলনে পরিণত হয়। ৩৬ দিনের মাথায় শেখ হাসিনা পদত্যাগ ও দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হন। এই ৩৬ দিনের মূল ঘটনাগুলো কী ছিল?

১ জুলাই, সোমবার

কোটা বাতিলের পরিপত্র পুনর্বহালের দাবিতে ছাত্রসমাবেশ ও বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে। এ সময় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে তিন দিনের কর্মসূচির ঘোষণা দেওয়া হয়।

এরপর পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ১

ছাত্র-গণ আন্দোলনে শ্রমজীবীসহ নিহত ও আহতদের হত্যার বিচার কর

সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-গণ আন্দোলনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারি বাহিনীর নিপীড়ন এবং দুই শতাধিক মানুষের জীবনহানি ও কয়েক হাজার মানুষের পঙ্গুত্ববরণ, আহতদের সুচিকিৎসা নিহত ও আহতদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ, হত্যার বিচার এবং ক্ষতিগস্তদের ক্ষতিপূরণের দাবিতে ২ আগস্ট প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত করে সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট।

শ্রমিক ফ্রন্টের সভাপতি রাজেকুজ্জামান রতনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন শ্রমিকনেতা আবদুর রাজ্জাক, আহসান হাবিব বুলবুল, নব কুমার কর্মকার, ইমাম হোসেন খোকন, খালেকুজ্জামান লিপন, আবু নাঈম খান বিপ্লব, জুলফিকার আলী, সেলিম মাহমুদ, নির্বাহী সদস্য আফজাল হোসেন প্রমুখ।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, ১৬ আগস্ট থেকে ছাত্র-গণ আন্দোলনে অসংখ্য মানুষ হতাহত হয়েছে। এর মধ্যে যেমন শিক্ষার্থী, শিশু-কিশোর, নারী রয়েছে, তেমনি হোটেল-পর্যটন কর্মী, গাড়িচালক, রিকশা চালক, হকার, গার্মেন্টসশ্রমিক, নির্মাণশ্রমিক, দোকান কর্মচারী, দিনমজুরসহ শ্রমজীবী মানুষও রয়েছে। পরিবারের উপার্জনকারী শ্রমজীবী মানুষের মৃত্যু, আহত বা গ্রেপ্তারের কারণে পরিবারের দুর্বিষহ পরিস্থিতি তৈরি হয়। সরকার নিহত এবং আহতদের প্রকৃত সংখ্যা স্বীকার করে পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ না করায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েও এই সকল শ্রমজীবীদের পরিবার ন্যায়বিচার এবং ক্ষতিপূরণ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং ছাত্রলীগসহ সরকারদলীয় কর্মীদের গুলিতেই এইসব হতাহতের ঘটনা ঘটলেও সরকার তা অস্বীকার করছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, শ্রমজীবীদের হয়রানি, গ্রেপ্তার বন্ধ এবং গ্রেপ্তারকৃতদের মুক্তি দিতে হবে। হতাহতের নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হবে, দায়ীদের সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদান, নিহতদের পরিবারকে যথাযোগ্য ক্ষতিপূরণ এবং আহতদের বিনামূল্যে চিকিৎসাসহ ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে।

নেতৃবৃন্দ সাধারণ ছুটির সময়ের মজুরি না কাটার জন্য এবং চাকরিচ্যুত না করার আহ্বান জানান।

সারা দেশে সাম্প্রদায়িক হামলা সহিংসতার নিন্দা

ঢাকায় বাম দলসমূহের মিছিল ও সমাবেশ

সর্বক্ষেত্রে বৈষম্য বিলোপ, ফ্যাসিবাদী শাসনের ভিত্তি উচ্ছেদ ও সাম্প্রদায়িক সহিংসতা রুখে দাঁড়ানো, ছাত্র-জনতা হত্যার বিচার, দুর্নীতির মূল উৎপাটনের দাবিতে ৬ আগস্ট ২৪ বেলা ১২টায় পুরা পল্টন মোড়ে বাম গণতান্ত্রিক জোট, ফ্যাসিবাদ বিরোধী বাম মোর্চা ও বাংলাদেশ জাসদের উদ্যোগে সমাবেশে অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের বীর শহিদদের শ্রদ্ধা জানিয়ে বলা হয়, গণবিক্ষোভে স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার পলায়ন ছাত্র জনতার বিজয়। এই বিজয়কে স্থায়ী করতে হলে স্বৈরাচারী ব্যবস্থার অবসান করে পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার ও শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে হবে।

সমাবেশে সারা দেশের মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা, ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সচেতন

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

সম্পাদক : রাজেকুজ্জামান রতন। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ, কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে প্রকাশক : বজলুর রশীদ ফিরোজ কর্তৃক ২৩/২ তোপখানা রোড (তৃতীয় তলা), ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।
সোনালী প্রিন্টিং প্রেস, ১৬৭ ইনার সার্কুলার রোড (ইডেন কমপ্লেক্স), মতিঝিল, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত। ফোন : ০২ ৪১০৫৩৬৪৪, ফ্যাক্স : ০২ ৪১০৫৩৬৪৪; E-mail : monthly.vanguard81@gmail.com